গণতন্ত্র ও ইসলাম

মুফতী তারেকুজ্জামান (হাফিযাহুল্লাহ্)

গণতন্ত্র_পরিচয়, প্রেক্ষাপট, বাস্তবতা ও কদর্যতা : গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার আকিদা বা বিশ্বাস হলো, ধর্ম ব্যক্তিজীবনে এবং ইবাদতখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে আর রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষের নিজস্ব মতামত দিয়ে পরিচালিত হবে। পক্ষান্তরে ইসলামি জীবনব্যবস্থার আকিদা হলো, মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা জীবনব্যবস্থা প্রদান করেছেন। জীবন ও রাষ্ট্র সকল কিছুই সে ব্যবস্থানুপাতে পরিচালিত হবে। আল্লাহর হুকুম কেবল ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

গণতন্ত্রের সূচনাকাল : খ্রিষ্ট সপ্তম শতাব্দী থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় মুসলিমদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে যেমন উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় যেতে হয়, চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের অধিবাসীদেরকেও তেমনই জ্ঞানের তালাশে মুসলিম অধ্যুষিত আন্দালুসের (আন্দালুসের বর্তমান নাম স্পেন) আল-হামরা, কর্ডোভা ও গ্রানাডায় ভিড় জমাতে হতো। সেকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সকল ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব ছিলো মুসলিমদের হাতে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত তারা অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সে সময় ইউরোপে খ্রিষ্টান পাদরিদের শাসন চলছিল। ইউরোপের পাদরি শাসকরা শোষণ ও নির্যাতন করার হাতিয়ার হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করত। পাদরিরা ধর্মের নামে মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা নিজেদের আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করত। পাশাপাশি তারা আরও দাবি করত যে, আল্লাহ তাআলা তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও তা তত্ত্বাবধায়ন করার ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যখন নতুন জ্ঞানচর্চার উন্মেষ ঘটে, মানুষ অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে আলোর দিকে আসতে শুরু করে, তখন তাদের নিকট পাদরিদের মনগড়া মতামত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হতে থাকে। এখান থেকেই তাদের সাথে জনগণের সংঘাত শুরু হয়। পাদরিরা আর কোনো উপায় না পেয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করতে লাগল। ধর্মের নামে পাদরিদের এ অধার্মিক আচরণ জনগণের মনে তীব্র ধর্মবিদ্বেষ সৃষ্টি করল। এরপর সাধারণ জনগণ জীবনের সকল বিভাগ থেকে পাদরিদের উৎখাত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হওয়া শুরু করল। ষোড়শ ও সপ্তদশ দীর্ঘ দুশতাব্দী ধরে এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতে থাকে। ইতিহাসে এ সংগ্রামযুদ্ধ **'গির্জা বনাম রাষ্ট্রের লড়াই'** নামে পরিচিত।

এ সংঘাতের সমাধানের জন্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা এগিয়ে আসল। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল নাস্তিক আর অন্যরা সরাসরি ধর্মকে অস্বীকার না করলেও রাষ্ট্রের মাঝে ধর্মের প্রভাবকে অস্বীকার করল। এভাবে তারা সকলে ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে আলাদা করে ফেলার সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করল। তাদের মতে ধর্ম নিতান্তই ব্যক্তিগত একটি বিষয়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে ধর্মকে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া যায় না। তারা শাসনব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করল এবং মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে একটি আপস রফায় উপনীত হলো।

এ আপসের প্রস্তাবে বলা হলো, 'ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং মানুষের ধর্মীয় দিকের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পাদরিদের হাতে থাকবে। আর জনগণকে শাসন করার কর্তৃত্ব থাকবে জনগণের হাতে। তাদের ওপর আর কারও কর্তৃত্ব থাকবে না। জনগণই আইন প্রণয়ন করবে এবং এ আইন দ্বারাই তারা শাসিত হবে। তারা যে বিধান রচনা করবে, তদ্বারা পরিচালনার জন্য নিজেরাই নিজেদের শাসক নিযুক্ত করবে। অবশ্য রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে পাদরিদের নিকটই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার শপথ গ্রহণ করতে হবে। এভাবে জনগণকে পাদরিদের শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য মানবরচিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।

নিঃসন্দেহে এটি সম্পূর্ণরূপে মানবরচিত একটি শাসনব্যবস্থা। পশ্চিমা সভ্যতার এ বিশ্বাসের ফলে জীবন ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে ফেলা হলো। ধর্ম সঠিক কি-না, তা তাদের বিবেচ্য বিষয় ছিল না; বরং তারা ধর্মকে সমস্যা মনে করে তাদের জীবন থেকেই তা সরিয়ে দিয়েছে। আর এখান থেকেই সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি হয়। আজ যারা সেক্যুলারিজমের কথা বলে তাদের এ কথা মনে রাখা উচিত যে, ধর্মনিরপেক্ষতা খ্রিষ্টান ধর্মের পাদরিদের সাথে জনগণের সৃষ্ট সমস্যা থেকে এসেছে, ইসলামের সৃষ্ট কোনো সমস্যা থেকে এর উৎপত্তি ঘটেনি। তারপরও তা জোর করেই মুসলিমদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, খ্রিষ্টান পাদরিরা ধর্মের নামে অন্যায় আচরণ ও মনগড়া নীতি প্রচার করত। আর তাই প্রকৃতপক্ষে জনগণের এ সংগ্রাম ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না; মৌলিকভাবে তা ছিল খ্রিষ্টান পাদরিদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে। কিন্তু পাদরিদের মোকাবেলা করতে গিয়ে তারা জীবন থেকে ধর্মকেই পরিত্যাগ করে বসল। যাকে বলে মাথাব্যথা দূর করার জন্য মাথা কেটে ফেলার পরামর্শ। এ গণতান্ত্রিক মতবাদ নাস্তিকদের মতো সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না বটে, তবে তাদের মতে দুনিয়ার জীবনে উন্নতি, শান্তি ও প্রগতির জন্য আল্লাহ বা নবি-রাসুলের কোনো প্রয়োজন নেই। তারা ব্যক্তিগত জীবনে ঐচ্ছিকভাবে ধর্মীয় বিধান মেনে চলা এবং সমাজ জীবনে আল্লাহকে অস্বীকার করার সুবিধা-সংবলিত মতবাদ তৈরি করে নিল। ফলে মানবসমাজের জন্য আল্লাহ তাআলাকে বিধানদাতা হিসাবে অস্বীকার করা হলো। এ বিশ্বের সকল কিছু যেহেতু আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, তাই সে মহাশক্তিশালী স্রষ্টার দেওয়া বিধানকে বাস্তব জীবনে গ্রহণ না করা এবং এতে বাধা দেওয়া সরাসরি আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ ও কুফরির শামিল। আল্লাহ তাআলাকে যদি পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে মান্য করা না-ই যায়, তাহলে কেবল ব্যক্তিজীবনে তাঁর ইবাদত অর্থহীন হয়ে পড়ে। আফসোসের বিষয় হলো, মুসলিমরা আজ ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে পশ্চিমা প্রভুদের নিকট নিজেদের সর্বস্ব বিক্রি করে বিশ্বস্ত গোলামের মতো তাদের প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে নিয়েছে।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও পরিচিতি :

আভিধানিক অর্থ : গণতন্ত্রের ইংরেজি হলো Democracy। শব্দটি মূলত গ্রীকভাষায় Demos এবং kratía শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত। Demos অর্থ জনগণ আর kratía অর্থ শাসন। তাহলে Democracy এর অর্থ হলো, জনগণের শাসন।

পারিভাষিক অর্থ : ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে : Democratic System of Government : A system of government based on the principle of majority decision-making. অর্থাৎ 'সরকারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি : সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গ্রহণের নীতির ওপর ভিত্তি করে সরকারব্যবস্থা।' [দেখুন- Encarta 2009 Encyclopedia Britannica 2012]

আধুনিক গণতন্ত্রের রূপদাতা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন : Government of the people, by the people, for the people. অর্থাৎ 'জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার।' [দেখুন- President Abraham Lincoln, The Gettysburg Address (Nov.19,1863)]

উইকিপিডিয়ায় গণতন্ত্রের বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে : 'গণতন্ত্র বলতে কোনো জাতিরাষ্ট্রের (অথবা কোনো সংগঠনের) এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক বা সদস্যের সমান ভোটাধিকার থাকে। গণতন্ত্রে আইন প্রস্তাবনা, প্রণয়ন ও তৈরির ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে, যা সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হয়ে থাকে।' [দেখুন- https://bn.wikipedia.org/wiki/গণতন্ত্র]

সুতরাং গণতন্ত্র বলতে জনগণের স্বার্থে জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বুঝানো হয়। তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা তৈরি করে এবং তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজেদের সার্বভৌমিক ক্ষমতার মধ্যে আইন রচনা করে। এভাবে জনগণ নিজেদের

ক্ষমতার অনুশীলন করে এবং নিজেরাই নিজেদের পরিচালনা করে। গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে আইন প্রণয়ন ও শাসক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার রয়েছে।

জনগণই এ ব্যবস্থায় বিধান ও আইন প্রণয়ন করে এবং তারা নিজেদের তৈরি কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কারও কাছে জবাবদিহি করে না। জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতা ধারণ করে এবং জনগণই তাদের সার্বভৌমত্ব চর্চা করতে পারে। তাই বলা যায়, জনগণই এ ব্যবস্থার প্রভু। আর জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি। এ বিশ্বাস থেকেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। ইসলাম এ বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে, দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় আল্লাহ তাআলার আদেশ এবং নিষেধ অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে এবং আল্লাহ তাআলা যে ব্যবস্থা দিয়েছেন, সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা আবশ্যক ও বাধ্যতামূলক। এর বিপরীত গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি ব্যবস্থা, যার সাথে ইসলামের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হতে বাধ্য। আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিধিবিধান নাজিল করেছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে আল্লাহর বিধিবিধানকে অস্বীকার করা হয়। তাই এটি মূলত আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারীদের প্রণীত ব্যবস্থা বা এককথায় এটা কুফরি ব্যবস্থা। তাই জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামের বিপরীতে তাদের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না; বরং সম্পূর্ণভাবে তা বর্জন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা এ সকল কিছুকে বর্জন করার কঠোর নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন :

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ

‘তারা বিচার-ফয়সালার জন্য তাগুতের (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের) কাছে যেতে চায়; অথচ তাগুতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার জন্য তাদের আদেশ করা হয়েছে।’ [সুরা আন-নিসা : ৬০]

যে আকিদা-বিশ্বাস থেকে এ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যে ভিত্তির ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত এবং যে চিন্তা-ধারণার সে জন্ম দেয়, তা সম্পূর্ণরূপে মুসলিমদের আকিদার বিপরীত এবং তাদের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক।

গণতন্ত্রের আকিদা-বিশ্বাস থেকে নিম্নোক্ত দুটি ধারণার উদ্ভব হয় :

১. সার্বভৌমত্ব জনগণের জন্য সাব্যস্ত।

২. জনগণই সকল ক্ষমতার উৎসমূল।

উপরিউক্ত দুটি ধারণার ওপর ভিত্তি করেই ইউরোপের দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ তাদের ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। এর দ্বারা পাদরিদের কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে জনগণের হাতে তা সমর্পণ করা হয়েছে। পোপদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফসল হিসেবে ধর্মীয় আইন-কানুনের অবসান করা হয়েছে। ফলে সার্বভৌমত্ব হলো জনগণের জন্য এবং জনগণই হলো সকল ক্ষমতার উৎস। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ দুটি ধারণাই বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ফলে জনগণই হয়ে যায় সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং সকল ক্ষমতার উৎস।

পক্ষান্তরে ইসলামে সার্বভৌমিক ক্ষমতা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের কিছু শাখাগত বিষয় বাহ্যিকভাবে এক মনে হলেও বাস্তবে এই দুটি দ্বীন বা জীবনব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একটি মেনে নিলে অপরটি আপনাপনি বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য। কোনো অবস্থাতেই উভয়টির সংমিশ্রণ হতে পারে না। হয় ইসলাম থাকবে; নচেৎ গণতন্ত্র।

শরিয়তের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র : গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বরূপ থেকে বোঝা গেলো যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অর্থ, মানবজাতির জন্য আল্লাহ তাআলার প্রণীত বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা। আর কোনো

সন্দেহ নেই যে, এটা সুস্পষ্ট কুফর। শরিয়তের দলিল—কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস সবকিছুর দ্বারা এর কুফরি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। নিম্নে পর্যায়ক্রমে দলিলসমূহ পেশ করা হলো।

কুরআন থেকে দলিল :

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

‘আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর তাআলার-ই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না। এটাই সরল পথ, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।’ [সুরা ইউসুফ : ৪০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

‘আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, সেসব লোকই কাফির।’ [সুরা আল-মায়িদা : ৪৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا.

‘আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের (ভিন্ন আরেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের) কোনো অধিকার নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হবে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে।’ [সুরা আল-আহজাব : ৩৬]

হাদিস থেকে দলিল :

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

يَكُوْنُ فِيْ أَخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَحْضُرُوْنَ السُّلْطَانَ فَيَحْكُمُوْنَ بِغَيْرِ حُكْمِ اللهِ وَلَا يَنْهَوْنَ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ.

‘শেষ যুগে এমন একদল লোক আসবে, যারা শাসকের কাছে যাতায়াত করবে। তারা আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে (মানবরচিত আইন দ্বারা) বিচার-শাসন করবে, কিন্তু তারা এ ব্যাপারে নিষেধ করবে না। সুতরাং তাদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।’ [আল-ফিরদাউস বি-মাসুরিল খিতাব, দাইলামি : ৫/৪৫৫, হাদিস নং ৮৭২৭, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত]

আউফ বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ

‘আমার উম্মত সত্তরের চেয়ে কিছু বেশি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এদের মধ্যে আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনার কারণ হবে ওইসব লোক, যারা নিজেদের (ব্যক্তিগত) মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে কিয়াস বা অনুমাননির্ভর ফয়সালা করবে; ফলে তারা হারামকে বৈধ ঘোষণা করবে এবং হালালকে অবৈধ ঘোষণা করবে।’ [মুসতাদরাকুল হাকিম : ৩/৬৩১, হাদিস নং ৬৩২৫, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত]

মুআজ বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ , أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يَقْضُونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ.

'সাবধান! অচিরেই কুরআন ও শাসক পৃথক হয়ে যাবে (অর্থাৎ শাসকেরা কুরআনের আইন দিয়ে বিচার-ফয়সালা করবে না)। সুতরাং তোমরা কখনো কুরআন থেকে পৃথক হয়ে যেয়ো না। শুনে রাখো, শীঘ্রই এমন কিছু নেতা আসবে, যারা তোমাদের জন্য (কুরআন-সুন্নাহর আইন বাদ দিয়ে নিজেদের মনমতো) বিচারকার্য পরিচালনা করবে। অতএব তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তাহলে তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করে দেবে। আর যদি তাদের বিরোধিতা করো, তাহলে তারা তোমাদের হত্যা করে ফেলবে।' [আল-মুজামুস সগির, তাবারানি : ২/৪২, হাদিস নং ৭৪৯, প্রকাশনী : আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত]

ইজমা থেকে দলিল :

প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানবরচিত আইন দিয়ে শরিয়তের বিধান ও বিচার-ফয়সালাকে যে কী পরিমাণ অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা হয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দিবালোকের ন্যায় এটা সবার কাছে সুস্পষ্ট। আর সাহাবায়ে কিরাম থেকে নিয়ে উম্মতের সকল উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, শরিয়তের আইন ও বিচার-ফয়সালাকে সন্দেহবশত কিংবা অস্বীকারমূলকভাবে প্রত্যাখ্যান করলে সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। এজন্যই তো সকল সাহাবির ঐকমত্যে জাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়েছে এবং তাদের বন্দীদেরকে দাস-দাসী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম জাসসাস আল-হানাফি রাহিমাহুল্লাহ সুরা নিসার ৬৫ নং আয়াত فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (কিন্তু না, আপনার রবের কসম! তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফয়সালা দেবেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে।) এটার ব্যাখ্যায় বলেন :

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدَّ شَيْئًا مِنْ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَوَامِرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ رَدَّهُ مِنْ جِهَةِ الشَّكِّ فِيهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْقَبُولِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ التَّسْلِيمِ, وَذَلِكَ يُوجِبُ صِحَّةَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي حُكْمِهِمْ بِارْتِدَادِ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَقَتْلِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاءَهُ وَحُكْمَهُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ

'এ আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা অথবা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ-নিষেধসমূহ থেকে কোনো একটি বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে (আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সামনে) আত্মসমর্পণ করা থেকে বিরত থাকুক। আয়াতটি সকল সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক জাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তাদের হত্যা ও তাদের পরিবার পরিজনদের বন্দী করার সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ফয়সালা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিচার ও বিধানকে মেনে নেবে না, সে ইমানদার নয়।' [আহকামুল কুরআন, জাসসাস : ২/২৬৮, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত]

একদল লোক আল্লাহ তাআলার বিধান জাকাতকে আংশিকভাবে অস্বীকার করার কারণে সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম সম্মিলিতভাবে তাদেরকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইমাম জাসসাস রাহিমাহুল্লাহ এর ভাষ্যমতে 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা অথবা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ-নিষেধসমূহ থেকে কোনো একটি বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।' অতএব যে শাসনব্যবস্থা পুরো রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে আলাদা করে দিয়ে এ স্লোগান প্রচার করছে, 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' এবং আল্লাহপ্রদত্ত হালালগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে—এসব পদ্ধতি কি স্পষ্ট কুফর নয়?!

কিয়াস বা যুক্তি থেকে দলিল :

সকলের জানা যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের গুরুদায়িত্বে অধিষ্ঠিত হলেন। তখন একদল লোক জাকাতের ফরজিয়্যাত বা আবশ্যকীয়তা অস্বীকার না করলেও খলিফার নিকট তা আদায় করতে অস্বীকৃতি জানাল। তাদেরকে জাকাত না দেওয়ার কারণ দর্শানোর আদেশ করা হলে তারা কুরআনের এ আয়াত থেকে দলিল পেশ করল, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً 'আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা (জাকাত) গ্রহণ করুন।' [সুরা আত-তাওবা : ১০৩] তারা এ আয়াত দিয়ে যুক্তি পেশ করে বলল, এখানে জাকাত আদায়ের আদেশ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে দেওয়া হয়েছে। আর এখন তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁচে নেই, তাই আমরা জাকাত দেবো না। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাদের এ ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকে অগ্রণযোগ্য আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র জিহাদ করে তাদের মাল-সম্পদ গনিমত হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করে দাস-দাসী হিসেবে বণ্টন করলেন।

ইমাম জাসসাস রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ, কাজি আবু ইয়ালা রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ-সহ অসংখ্য ফকিহ ও মুহাদ্দিস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাদের মুরতাদ আখ্যায়িত করেই তাদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। অনেক ফকিহ এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর ইজমা বা ঐকমত্য ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর যুদ্ধের ধরন থেকেও এর পক্ষে প্রমাণ মেলে। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাদের পরিবার-পরিজনকে যুদ্ধবন্দী করেছিলেন। তারা কালিমা পাঠ করত, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করত। নামাজ, রোজা, হজ, তাহাজ্জুদ-সহ অন্যান্য সকল বিধানও পালন করত। কিন্তু কেবল একটি বিধান পুরোপুরিভাবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম সর্বসম্মতিক্রমে তাদের মুরতাদ ঘোষণা করেছিলেন। এরপর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

সুতরাং দ্বীনের একটি মাত্র বিধানকে অমান্য করলে যেখানে মানুষের ইমান থাকে না, তাহলে যে শাসনব্যবস্থা পুরো রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে আলাদা করে দিয়েছে এবং স্লোগান তুলছে, 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' সেটার কী অবস্থা হবে? শুধু এতটুকুই-ই নয়; বরং নিজেদের স্বপক্ষে কুরআনের এ আয়াত থেকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে দলিলও পেশ করা হচ্ছে যে, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই' [সুরা আল-বাকারা : ২৫৬]; অথচ এটার সাথে তাদের দাবির কোনোই সম্পর্ক নেই। এরকম একটি নয় দুটি নয়; বরং দ্বীনের শত শত বিধানকে অপব্যাখ্যা ও অমান্য করা হচ্ছে। শুধু অমান্য করা হচ্ছে এমনটিই নয়; বরং গণতান্ত্রিক পন্থায় সবকিছু করেও দাবি করা হচ্ছে, মদিনা সনদ অনুযায়ী দেশ চলছে। যে ক্ষমতায় যায় সে-ই বলছে, আমরা কুরআন সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করিনি এবং সামনেও করব না; অথচ প্রচলিত আইনব্যবস্থায় কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী অসংখ্য আইন বিদ্যমান রয়েছে। বরং পুরো সিস্টেমটাই কুফরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যদি শরিয়তের একটি বিধান প্রত্যাখ্যান করার কারণে তা সুস্পষ্ট কুফর বলে গণ্য হয়, তাহলে সিস্টেমগতভাবে এবং অসংখ্য শারয়ি বিধানকে অমান্য ও নিষিদ্ধ করার পরও কি এ গণতন্ত্র কুফরি তন্ত্র বলে বিবেচিত হবে না?! কিয়াস ও যুক্তি তো এটাই বলে যে, এটা নিঃসন্দেহে কুফরি ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা কি হকের মানদণ্ড?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা-ই হচ্ছে সকল সিদ্ধান্তের মানদণ্ড। এ ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই সকল জনগণের মত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, আইন প্রণয়ন করা, প্রতিনিধি নির্বাচন করা, সরকারের ইতিবাচক বা নেতিবাচক অবস্থা যাচাই করা-সহ সকল ক্ষেত্রেই যেদিকে বেশি ভোট পড়ে, সেটিই সঠিক বলে বিবেচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও অশিক্ষিত লোকদের মতামত এক পাল্লায় মাপা হয়। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতেই আল্লাহ তাআলার হালাল বিধানকে হারাম আর হারাম বিধানকে হালাল করা হয়। পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে যদি দুনিয়ার সকল মানুষও একত্রিত হয়ে কোনো হারামকে হালাল হওয়ার পক্ষে মত দেয়, তবুও তা কোনোদিন হালাল হবে না এবং তা গ্রহণ করা যাবে না।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতার অপব্যবহার : পশ্চিমা রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন ধর্ম থেকে তাদের জীবনকে আলাদা করে ফেলল, তখন সে তার নিজের সিদ্ধান্তকে আল্লাহর হুকুমের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল। তাদের সিদ্ধান্তের মূল চালিকাশক্তি হয়ে গেল লাভ-লোকসান। তারা ভালো-মন্দ, পছন্দ-অপছন্দ কোনো কিছু করা কিংবা না করা, সকল কিছু নির্ধারণ করতে লাগল লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে। এভাবে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে চারটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। মানদণ্ড চারটি হলো :

ক. বিশ্বাসের স্বাধীনতা

খ. মত প্রকাশের স্বাধীনতা

গ. মালিকানার স্বাধীনতা

ঘ. ব্যক্তি স্বাধীনতা

বিশ্বাসের স্বাধীনতা : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষকে বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থার আওতায় কোনো মানুষ যেকোনো কিছুকে আকিদা বা বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। যেকোনো কিছুর ওপর ঈমান আনতে পারে কিংবা যেকোনো বিশ্বাস প্রত্যাখ্যানও করতে পারে। একজন মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করতেও পারে আবার ইচ্ছে করলে না-ও করতে পারে। অনুরূপ একজন মানুষ চাইলে নামাজ পড়তে পারে, আবার চাইলে সে মূর্তিপূজায়ও অংশগ্রহণ করতে পারে। এ হচ্ছে তার বিশ্বাসের স্বাধীনতা। আজকাল গণতন্ত্র চর্চার ফলে আমাদের সমাজে এ প্রভাব স্পষ্টভাবেই লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন অনেক মুসলিম যুবক শবে কদরে সারারাত জেগে ইবাদত করে, আবার পহেলা বৈশাখে মঙ্গল প্রদীপের নামে অগ্নিপূজাও করে। একইভাবে তারা যেমন ঈদের নামাজে দলবেঁধে শামিল হয়, তেমনই দুর্গাপূজাকে সর্বজনীন বলে তাতেও অংশগ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। যেমন আমাদের দেশের একটি বড় রাজনৈতিক দলের শীর্ষ এক নেতা বিগত ১৩ জুলাই ২০১১ এক অনুষ্ঠানে বলেছিল, 'আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই।' সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিজের জীবনব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করেছে বলেই তার আকিদার স্বাধীনতা থেকে এ কথাগুলো বলতে পেরেছে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় যে কেউ তার আকিদা-বিশ্বাস পরিবর্তন করতে পারে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা : মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি। এ ব্যবস্থায় কোনো ব্যক্তি যে সকল চিন্তা-চেতনা ধারণ করে, তা সে প্রকাশ করার অধিকার রাখে এবং এ মতের দিকে অন্যদেরকেও আহ্বান করতে পারে। এ ব্যাপারে সে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। এ ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রায়শই অন্য মত বা ব্যক্তি আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গণতন্ত্রপন্থীরা মত প্রকাশের স্বাধীনতার আশ্রয় গ্রহণ করে নানা অপকর্ম করে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতীয় বংশদ্ভুত সালমান রুশদি satanic verses লিখে ইসলামকে আক্রমণ করেছিল এবং এটাকে তার মত প্রকাশের অধিকার বলে চালিয়ে দিয়েছিল। পশ্চিমা মিডিয়াগুলোও জিগির তুলেছিল যে, সে তার মতামত প্রকাশের অধিকার রাখে। একইভাবে ডেনমার্কের কার্টুনিস্ট এবং আমাদের দেশের প্রথম আলো পত্রিকা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন করে এটাকে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে প্রচার করেছিল। এভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা মূলত ভিন্নমত বা বিশ্বাসকে আক্রমণ করার অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে।

পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে, মুসলিমদের সকল মতামত ও চিন্তা-বিশ্বাস শরিয়তের আলোকে হতে হবে। ইসলামি শরিয়াহ অনুমোদন করে না—এমন কোনো মতামত বা চিন্তা-বিশ্বাস মুসলিমরা রাখতে পারবে না। কেউ যদি সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মালিকানার স্বাধীনতা : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু অবাধ ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতা আছে এবং এর মূল বিশ্বাসই হচ্ছে, যেকোনো উপায়ে অধিক পরিমাণ লাভ পাওয়া, তাই এ ব্যবস্থায় কেউ ইচ্ছা করলে প্রচুর পরিমাণ পণ্য মজুদ করে পণ্যের দাম বাড়িয়েও ব্যবসা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাছে সে কোনো অপরাধী নয়।

পক্ষান্তরে ইসলাম জনগণের ভোগান্তি হতে পারে—এমন সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। কেউ এরকম কোনো কাজ করলে রাষ্ট্র তাকে প্রতিহত করবে এবং প্রয়োজনে তাকে শাস্তি প্রদান করবে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা কোনো ব্যক্তিকে সকল প্রকার বিধিনিষেধ থেকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি হচ্ছে মুখ্য। এ স্বাধীনতার ফলে সে যেভাবে জীবনের চাহিদা মেটাতে পছন্দ করে, সেভাবে তা উপভোগ করবে এবং সেখান থেকে কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে পশ্চিমা সমাজে যে অধঃপতিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এবারে তার গুটিকয়েক নমুনা তুলে ধরা যাক।

এক. অবাধ যৌনাচার

ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে পশ্চিমা সমাজে যৌনাচারের বিস্তার লাভ করেছে। কিশোর-কিশোরীরা যথেচ্ছা যৌনাচারে লিপ্ত হলেও মা-বাবারও কিছু করার থাকে না। কারণ, এ অধিকারটি তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আওতায় পড়ে। পশ্চিমা দেশের রাস্তা-ঘাটে, পার্কে, বাসে, অনুষ্ঠানে, এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের জড়াজড়ি, আলিঙ্গন ও চুম্বন মহড়া কারও দৃষ্টির তোয়াক্কা করে না। তারা নগ্ন হয়ে চলাফেরা করতে পারে, মাতাল হতে পারে, অনেক নারী-পুরুষ একত্রে একই স্থানে একই সময়ে যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারে, যা বনের জীব-জানোয়ারকেও হার মানায়। অস্ট্রেলিয়াতে এক বাবা তার মেয়েকে সাত বছর আটকে রেখে ধর্ষণ করেছে, যা অনেকেই মিডিয়াতে লক্ষ করেছেন। এটা হলো তার ব্যক্তি স্বাধীনতা। তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না; এমনকি তাদের অনেকে নিজের মা-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে পর্যন্ত যৌনাচার করে থাকে। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক।

পক্ষান্তরে ইসলামি জীবনব্যবস্থায় মানুষ কীভাবে তাদের যৌন চাহিদা মেটাবে, তার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ইসলাম মিলনের ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা প্রদান করেছে। হয় তাকে বিবাহ করতে হবে, নয়তো কোনো দাসীর মালিকানা অর্জন করতে হবে। এ দুই পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো সম্পর্কের ভিত্তিতে নারী-পুরুষ একান্তে মিলিত হতে পারবে না। এ শৃঙ্খলা রক্ষায় ইসলাম কঠোর শাস্তির বিধান আরোপ করেছে।

দুই. সমকামিতা

যেহেতু গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে, তাই পশ্চিমা পার্লামেন্ট আজ তাদের বিকৃত চাহিদা মেটানোর জন্য সমকামী বিবাহের বৈধতা দান করেছে। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। আর এটি এখন বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের স্বাভাবিক আচরণে পরিণত হয়েছে। এমনকি আজ পশ্চিমা সমাজ বর্বরতার এমন স্তরে গিয়ে উপনীত হয়েছে যে, তারা কুকুর, বিড়াল ও বিভিন্ন পশুর সাথে নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাতেও দ্বিধাবোধ করে না।

পক্ষান্তরে ইসলাম এই গর্হিত কাজকে কঠিনভাবে ঘৃণা করে। এমনকি শরিয়াহ তার জন্য যথাযথ ও কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছে। পূর্ববর্তী একাধিক জাতিকে আল্লাহ তাআলা এ জঘন্য অপরাধের কারণে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

তিন. লিভ টুগেদার

পশ্চিমা ব্যবস্থায় আজ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে চলছে লিভ টুগেদারের রমরমা প্রচলন। পবিত্র বিবাহব্যবস্থাকে ঝামেলাপূর্ণ মনে করে অনেক মানুষ এখন বিবাহ ছাড়াই এক ছাদের নিচে রাত কাটাচ্ছে। যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে, তখন প্রত্যেকে যার পথ সে বেছে নিচ্ছে। এভাবে বৈবাহিক জীবনকে তাদের সমাজব্যবস্থা থেকে ছুঁড়ে ফেলায় তাদের বার্ধক্যে কোথাও ঠাঁই মিলছে না। একপর্যায়ে হতাশায় কেউ আত্মহত্যা করছে, কেউ ইউগার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে আর কেউ বা পথে পথে ঠোকর খেয়ে ফিরছে।

পক্ষান্তরে ইসলাম দাসীর মালিকানা ও বিবাহ বহির্ভূত সকল যৌন সম্পর্ককে কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। এর জন্য ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। শরিয়ায় বিভিন্নভাবে বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আর তাই বিচ্ছিন্নভাবে গোপনে কিছু লিভ টুগেদারের ঘটনা ঘটলেও আজও মুসলিম সমাজকে প্রকাশ্যে এ ভাইরাস সংক্রমণ করতে পারেনি। এরকম গর্হিত একটি ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে মুসলিমদের কলুষিত করতে পারেনি।

ফিরআউনি ব্যবস্থার আধুনিক সংস্করণ : এ বিষয়টি আজ উপলব্ধি করা বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে যে, ফিরআউন প্রথমদিকে ছিল একজন সাধারণ রাষ্ট্রপ্রধান। সে অন্যান্য রাজা-বাদশাদের মতোই জুলুম-ইনসাফ মিলিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে দীর্ঘমেয়াদি রাজত্ব পেলে তাকে অহংকার পেয়ে বসল। ফলে সে নিজের জন্য সার্বভৌমত্ব দাবি করে নিজেকে জনগণের রব ঘোষণা করল। শুধু রবই নয়; বরং সবচেয়ে বড় রব হিসেবে নিজেকে জাহির করল।

কুরআনের মাধ্যমে ফিরআউনের কাহিনী আমাদের নিকট পেশ করার কারণ হলো, আমরা যেন এমন কোনো রাজা-বাদশাকে বা এমন কোনো ব্যবস্থাপনাকে না মানি, যারা সার্বভৌমত্বের দাবি করে বসে। আমরা যেন ফিরআউনের মতো কোনো শাসককে মেনে শিরকে নিপতিত না হয়ে যাই। কারণ, আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে অন্য কারও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার মানেই হচ্ছে তাকে রব বলে স্বীকার করে নেওয়া। যদি ফিরআউনকে মানলে শিরক হয়, তাহলে এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মানলেও শিরক হবে। মুসলিমরা এসব নব্য ফিরআউনদের অনুসরণ করে যাতে আবার শিরকের মধ্যে হাবুডুবু না খায়, তা থেকে সর্তক করার জন্যই আল্লাহ তাআলা ফিরআউনের কাহিনী আমাদের কাছে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আজ গণতন্ত্ররূপী নব্য ফিরআউনবাদ জনগণকে আল্লাহর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল করলে অনেকখানি-ই স্পষ্ট হয়ে যাবে। বিষয়গুলো হলো :

১. ইসলাম আল্লাহর দেওয়া পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনব্যবস্থা। পক্ষান্তরে গণতন্ত্র হচ্ছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের তৈরি ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতের পূর্ণতা দান করেছি এবং দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করেছি।' [সুরা আল-মায়িদা : ৩]

২. ইসলামি শরিয়তে সর্ব বিষয়ে যাবতীয় ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই হলো সকল ক্ষমতার অধিকারী, যা জনগণের নির্বাচিত সাংসদদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আসমানসমূহ ও জমিনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; আর তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।' [সুরা আল-হাদিদ : ২]

৩. ইসলামে আইনের উৎস হলো কুরআন-সুন্নাহ। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে আইনের উৎস হলো অধিকাংশ মানুষের বিবেকপ্রসূত রায় ও মতামত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

'বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই।' [সুরা ইউসুফ : ৪০]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন :

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

‘জেনে রাখো, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশদান একমাত্র তাঁরই কাজ।’ [সুরা আল-আরাফ : ৫৪]

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর অবতীর্ণকৃত বিধানানুসারে যারা বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফির, তারাই জালিম, তারাই ফাসিক। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলছে, কোর্ট-কাচারিতে দেশের মানবরচিত সাংবিধানিক আইন চলে, এখানে আল্লাহর আইন ও বিচারব্যবস্থা কার্যকর নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

‘যেসব লোক আল্লাহর অবতীর্ণকৃত বিধানানুসারে বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।’ [সুরা আল-মায়িদা : ৪৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

‘যেসব লোক আল্লাহর অবতীর্ণকৃত বিধানানুসারে বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই জালিম।’ [সুরা আল-মায়িদা : ৪৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

‘যেসব লোক আল্লাহর অবতীর্ণকৃত বিধানানুসারে বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক।’ [সুরা আল-মায়িদা : ৪৭]

৫. ইসলামের শিক্ষা নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। আর গণতন্ত্রের শিক্ষা ব্যক্তিস্বার্থ ভোগবাদ। সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

‘তোমাদের কেউ (প্রকৃত) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।’ [সহিহুল বুখারি : ১/১২, হাদিস নং ১৩, প্রকাশনী : দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত]

৬. ইসলামে তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস এবং আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা অপরিহার্য। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে আল্লাহর অস্তিত্ব উপেক্ষিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

‘আর তাদের একমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ (ইবাদতের উপযুক্ত) নেই। কাফিররা যেসব অংশীদার সাব্যস্ত করে তিনি তা থেকে পবিত্র।’ [সুরা আত-তাওবা : ৩১]

ইসলামে গণতন্ত্রের ধারণা : গণতন্ত্রের বিষয়ে অনেকেরই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ধারণা নেই। ভাসাভাসা কিছু জানা থাকলেও অনেকেই বিপরীত পক্ষের যুক্তিগুলো শুনলে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং যথাযথ উত্তর দিতে না পেরে নির্বাক হয়ে পড়েন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যদি কারও গণতন্ত্রের ব্যাপারে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা থাকে তাহলে তার জন্য যে কারও সাথে কথা বলার হিম্মত এসে যাবে এবং স্বচ্ছ ধারণা রাখার কারণে তার আকিদা-বিশ্বাসও বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। বিশেষ ওজর বা রাজনৈতিক মাসলাহাতের কারণে কেউ গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে শরিক থাকলে সেটা ভিন্ন বিষয়, কিন্তু এটার মূল বিধান কী হবে, সে ব্যাপারে তাকে কখনো হীনম্মন্যতায় ভুগতে হবে না। এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্যকর্তব্য হলো, গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক বিধান কী, তা জেনে নেওয়া। এ চিন্তা থেকেই আজকের এ ছোট্ট প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। আশা করি, এটা পড়লে গণতন্ত্রের বিষয়ে আমাদের ধারণা

আরও স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হবে ইনশাআল্লাহ। আজ এখানে স্রেফ মৌলিক কয়েকটি পয়েন্টে আলোচনা করার চেষ্টা করব। পূর্বের আর্টিকেলটি পড়ে থাকলে এটা পূর্ণতার কাজ দেবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত, আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, গণতন্ত্র হলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি জীবনব্যবস্থা। কেননা, এটা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণ বা তাদের প্রতিনিধি তথা সাংসদের হাতে অর্পন করে। এ ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণরূপে গাইরুল্লাহ তথা জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিদের জন্য সাব্যস্ত করা হয়। এতে যেকোনো সিদ্ধান্ত সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে নয়; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই গ্রহণযোগ্যতা পায়। সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত পুরো জাতির জন্য অবশ্যপালনীয় আইনে পরিণত হয়ে যায়; যদিও তা দ্বীন, ফিতরাত ও বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিকক হয়। মানবরচিত এ ব্যবস্থাতে ভ্রুণমোচন, সমকামী বিবাহ, সুদভিত্তিক লেনদেন, শারয়ি দণ্ডবিধি রহিতকরণ, পতিতালয় ও মদপানের লাইসেন্স, অবাধ যৌনাচার-সহ যেকোনো আইন পাশ করানোর সুযোগ রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদ রায় দিলেই এসব নিকৃষ্ট ও শারিয়া-বিরুদ্ধ আইন জারি হয়ে যায়। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সবাইকে সে আইনকে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। এ হিসেবে বলা যায়, এ গণতান্ত্রিক এ সিস্টেম পুরা ইসলামের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং মুসলিমদের সামগ্রিক জীবনে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন পালনে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা প্রদান করে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, বিচার ও শাসনক্ষমতা একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত এবং তিনিই হলেন শ্রেষ্ঠতম বিচারক। তিনি তাঁর শাসনক্ষমতায় কাউকে অংশীদার বানাতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, তার চেয়ে উত্তম বিচারক আর কেউ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

‘বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত কোরো না। এটাই শাশ্বত দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।’ [সুরা ইউসুফ : ৪০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

‘অতএব যাবতীয় কর্তৃত্ব আল্লাহরই, যিনি সমুচ্চ, মহান।’ [সুরা আল-মুমিন : ১২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

‘আল্লাহ তাআলা কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?’ [সুরা আত-তিন : ৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً

‘আর তিনি কাউকে নিজ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে অংশীদার বানান না।’ [সুরা আল-কাহফ : ২৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

‘তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?’ [সুরা আল-মায়িদা : ৫০]

আল্লাহ তাআলা সকল মাখলুকের স্রষ্টা। তাই তাদের জন্য কল্যাণকর ও উপযোগী বিধিবিধান তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। মানবসত্তা সাধারণত জ্ঞান-গরিমা, স্বভাব-চরিত্র ও অভ্যাসের দিক দিয়ে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তারা অন্যদের কল্যাণকর বিষয়াদি সম্পর্কে জানা তো দূরে থাক; স্বয়ং নিজেদের কল্যাণকর বিষয় সম্বন্ধেই সম্যক জ্ঞান রাখে না। আর এজন্যই যে সমাজ ও দেশে জনগণই নিজেদের জীবনযাত্রার জন্য সংবিধান ও আইন-কানুন প্রণয়ন করে সে দেশে দুর্নীতি, চারিত্রিক অবক্ষয় ও সামাজিক বিপর্যয় পরিদৃষ্ট হতে থাকে।

সাথে এটাও লক্ষণীয় যে, অনেক দেশে এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবতাহীন এক বাহ্যিক অবয়ব ও শুধুই শ্লোগানে পরিণত হয়েছে, যার মাধ্যমে মূলত মানুষকে ধোকা দেওয়া হয়। বাস্তবিক অর্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করে কেবল ক্ষমতাসীনরা। জনগণ এদের আদেশের সামনে নত ও পরাজিত থাকে। এ ব্যাপারে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে যে, গণতন্ত্রের কোনো আইন যখন রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অভিলাষের বিপরীত হয় তখন তাকে তারা পদদলিত করে পিষ্ট করে। নির্বাচনী জালিয়াতি, মানুষের স্বাধীনতাহরণ, সত্য ও ন্যায় প্রকাশকারীদের মুখবন্ধকরণের ঘটনাগুলো এমন কিছু বাস্তবতা, যা কমবেশি সবারই জানা। দিবালোকের মতো পরিষ্কার এ বিষয়ের জন্য আলাদা কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই। মূলত আলোকোজ্জ্বল দিনে সূর্যের অস্তিত্বের জন্য যখন দলিলের দরকার পড়ে তখন বিবেক কোনোকিছুর জন্যই আর উপযোগী থাকে না।

‘মাওসুআতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিবিল মুআসিরা’ গ্রন্থে বলা হয়েছে :

ديمقراطية نيابية : أحد مظاهر النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر السيادة بواسطة مجلس منتخب من نواب من الشعب ، وفيها يحتفظ الشعب بحق التدخل المباشر لممارسة بعض مظاهر السيادة عن طريق وسائل مختلفة ، أهمها :

1. حق الاقتراع الشعبي : بأن يقوم عدد من أفراد الشعب بوضع مشروع للقانون مجملاً أو مفصَّلاً ، ثم يناقشه المجلس النيابي ويصوِّت عليه .

2. حق الاستفتاء الشعبي : بأن يُعرض القانون بعد إقرار البرلمان له على الشعب ليقول كلمته فيه

3. حق الاعتراض الشعبي : وهو حق لعدد من الناخبين يحدده الدستور للاعتراض في خلال مدة معينة من صدوره ، ويترتب على ذلك عرضه على الشعب في استفتاء عام ، فإن وافق عليه نُفِّذ....... وإلا بطل ، وبه تأخذ معظم الدساتير المعاصرة.

‘সংসদীয় গণতন্ত্র : এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি রূপ, যাতে জনগণ তাদের প্রতিনিধির নির্বাচিত কাউন্সিলের মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব প্রকাশের অনুশীলন করে থাকে। এতে মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সার্বভৌমত্বের কিছু দিক অনুশীলন করার জন্য সরাসরি হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে। তন্মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদ্ধতি হলো :

১. ভোটাধিকার : তা এভাবে যে, কতিপয় জনপ্রতিনিধি সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিতভাবে একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করবে। অতঃপর পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ এ বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে সে ব্যাপারে (হ্যাঁ-বাচক কিংবা না-বাঁচক) ভোট দেবে।

২. গণভোটাধিকার : তা এভাবে যে, পার্লামেন্টের অনুমোদনের পর তা জনগণের সামনে প্রকাশ করা হবে, যাতে এ ব্যাপারে তারা তাদের মন্তব্য পেশ করতে পারে।

৩. বিরোধিতাধিকার : এটা শুধুমাত্র নির্বাচিত কতিপয় সদস্যের অধিকার। আইনটি প্রকাশিত হওয়ার নির্দিষ্ট কিছুদিনের মধ্যেই বিরোধিতা করার জন্য সংবিধান সময় নির্ধারিত করে দেয় এবং গণভোটের জন্য জনগণের নিকট তা প্রকাশ করা এই ভোটের ফলের ওপর নির্ভর করে। যদি এটার পক্ষে (অধিকাংশের) ভোট পড়ে তাহলে তা বাস্তবায়িত হয়, নচেৎ তা প্রত্যাখ্যাত বলে বিবেচিত হয়। বর্তমানের বেশিরভাগ সংবিধান এ নিয়মই অনুসরণ করে থাকে।’ [মাওসুআতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিবিল মুআসিরা : ২/১০৬৬]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইবাদত ও আনুগত্য কিংবা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিরকের নতুন একটি প্রকার। যেহেতু এতে মহান সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব ও নিঃশর্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অধিকারকে বাতিল করে তা মানুষের অধিকার বলে সাব্যস্ত করা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত কোরো না। এটাই শাশ্বত দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।' [সুরা ইউসুফ : ৪০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

'বিধান দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই।' [সুরা আল-আনআম : ৫৭]

দ্বিতীয়ত, অনেক মানুষ ধারণা করে, গণতন্ত্র মানেই স্বাধীনতা। কিন্তু এটা সঠিক ধারণা নয়। বাস্তবে এ স্বাধীনতা মানুষের জন্য বিষতুল্য। এটা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর স্বাধীনতা নয়। বস্তুত গণতন্ত্রে যে স্বাধীনতার কথা বলা হয়, সেটা দ্বারা উদ্দেশ্য বিশ্বাসগত স্বাধীনতা, চারিত্রিক অবক্ষয়ের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় এর অপকারিতা অনেক বেশি। এমনকি মত স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বিষয়টি এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, আল্লাহ, কুরআন, নবি-রাসুল ও সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারেও অপবাদ আরোপ ও বিভিন্ন সমালোচনা করা হচ্ছে। আর এ স্বাধীনতার দোহাই দিয়েই পর্দাহীনতা, অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিবর্জিত ছবি-সিনেমা সম্প্রচারের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এরকম আরও অনেক বিষয় রয়েছে, যার সবগুলোই নৈতিকতা ও ধর্মীয়ভাবে জাতির ধ্বংসের ব্যাপারে অবদান রাখছে।

তাছাড়াও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে স্বাধীনতার দাবি করে থাকে তাও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত নয়। কেননা, আমরা এ স্বাধীনতাকে নিজ স্বার্থ ও সুবিধা অনুযায়ী সীমাবদ্ধ দেখি। যে সময়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে সমালোচনা ও কটুক্তিকে গণতন্ত্র অনুমোদন করে থাকে ঠিক সে সময়েই ইহুদিদের সাথে নাৎসিদের নৃশংসতা নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতা খর্ব হতে দেখি। এটাকে অস্বীকার করার অধিকার কাউকে দেওয়া হয় না। শুধু এতটুকুই নয়; বরং এ নৃশংসতার কথা কেউ অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাকে কারাবরণও করতে হয়। অথচ এটা এমন একটি ইতিহাস, দলিল-প্রমাণের আলোকে যা ভালোভাবেই অস্বীকার করার সুযোগ আছে।

এরা যদি স্বাধীনতারই দাবিদার হয়ে থাকে তাহলে কেন মুসলিম সম্প্রদায়কে তাদের পথ ও ধর্ম বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয় না? কেন তারা তাদের দেশে উপনিবেশ করে এবং তাদের ধর্ম-বিশ্বাস পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় লেগে আছে? ইতালি কর্তৃক লিবিয়ার গণহত্যা, ফ্রান্স কর্তৃক আলজেরিয়ার গণহত্যা, ব্রিটিশ কর্তৃক মিশরের গণহত্যা ও আমেরিকা কর্তৃক আফগান ও ইরাকের গণহত্যার ব্যাপারে তাদের এ স্বাধীনতা কোথায় গেল?

গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দাবিদাররা যখন দেখল যে, স্বাধীনতাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যায় না; বরং অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতার সাথে তাদের কথিত স্বাধীনতার সাংঘর্ষিকতা অনিবার্য তখন তারা স্বাধীনতার অর্থকে কিছু নিয়ম-কানুনের দ্বারা শৃঙ্খলিত করে দিল। যেমন :

১. আইন : গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন কোনো ব্যক্তির জন্য এ অধিকার নেই যে, সে রাস্তায় চলার বিপরীত দিক দিয়ে চলবে। অনুরূপ কারও এ অধিকারও নেই যে, লাইসেন্স ছাড়া কোনো দোকান বা ব্যবসা-বানিজ্য চালাবে। যদি সে বলে, আমি তো স্বাধীন তথাপিও তার কথার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হবে না।

২. সমাজ : উদাহরণস্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে একজন নারী গোসলের সংক্ষিপ্ত পোশাক পরিধান করে কোনো শোকাক্রান্ত বাড়ি যেতে পারে না। যদি সে বলে, আমি তো স্বাধীন একজন নারী তথাপিও লোকজন তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে এবং তাকে তাড়িয়ে দেবে। কারণ, এটা সামাজিকতা পরিপন্থী।

৩. স্বাভাবিক রুচি : উদাহরণস্বরূপ তাদের কেউ মানুষের সামনে বায়ুত্যাগ করতে পারে না; এমনকি ঢেকুরও তুলতে পারে না। এতে মানুষ তাকে তুচ্ছ ও ইতর মনে করবে; যদিও সে বলে আমি তো স্বাধীন।

এ পর্যায়ে আমরা বলতে চাই : তাহলে আমাদের দ্বীন ইসলামের জন্যও কেন কিছু শৃঙ্খলতা ও সীমাবদ্ধতা তৈরি করা যাবে না? যেমনিভাবে তাদের অবাধ স্বাধীনতাকেও কিছু বিষয়ের সাথে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যা তারা অস্বীকার করতে পারে না। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দ্বীনের আনিত বিধি-বিধানের মাঝেই রয়েছে মানুষের সমূহ কল্যাণ। অতএব নারীর পর্দাহীনভাবে বের হওয়া, মানুষের মদপান ও শূকরের গোশত ভক্ষণ ইত্যাদির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এগুলোর মাঝে মানুষের শরীর, বিবেক ও জীবনের জন্য সুনিশ্চিত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কিন্তু ধর্মীয়ভাবে এ আদেশ হলে তারা স্বাধীনতার এ সীমাবদ্ধতা ও শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে ফেলতে চায়। আর যদি আদেশটি তাদের মতোই কোনো মানুষের পক্ষ থেকে কিংবা তাদের রচিত কোনো আইনগতভাবে আসে তাহলে তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মানলাম!

তৃতীয়ত, অনেকেরই ধারণা, ‘গণতন্ত্র’ ইসলামের ‘শুরা’ এর সমার্থক। কিন্তু অনেকগুলো কারণে এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। কতিপয় কারণ নিম্নরূপ :

১. শুরা বা পরামর্শ হয় কেবল নিত্যনতুন সমসাময়িক বিষয়াদি এবং কুরআন-সুন্নাহয় যে বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ নেই সেগুলো নিয়ে। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দ্বীনের অকাট্য প্রমাণিত বিধি-বিধানেরও বিরোধিতা করার সুযোগ দেওয়া হয়। অতএব এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদের মত নিয়ে শারিয়াহ-নিষিদ্ধ বিষয়ের নিষেধাজ্ঞাকে উঠিয়ে দেওয়া হয় এবং আল্লাহ তাআলা যেটা অনুমোদন বা আবশ্যক করেছেন তা নিষিদ্ধ করে দেয়। মদ বিক্রির লাইসেন্স এ সংবিধানের দ্বারাই দেওয়া হয়। পতিতাবৃত্তি ও সুদি লেনদেনেরও একই অবস্থা। এ সংবিধানের দ্বারাই ইসলামি প্রতিষ্ঠান ও আল্লাহর পথে আহবানকারীদের কর্মস্থল সংকীর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে। এতে শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিকতা সুস্পষ্ট। তাহলে এটা কী করে শুরা হতে পারে?

২. শুরা মজলিস গঠিত হয় দ্বীনের পাণ্ডিত্য, ইলম, বিবেক, মেধা, চরিত্র ইত্যাদি বিবেচনায় উত্তীর্ণ একদল যোগ্য লোকের সমন্বয়ে। অতএব এখানে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও নির্বোধ শ্রেণীর সাথে পরামর্শ করার কোনোই সুযোগ নেই; ইসলামের শত্রু কাফির বা নাস্তিকদের ব্যাপার তো দূরে থাক! কিন্তু গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট বোর্ডে এগুলোর কোনোই গুরুত্ব নেই। এজন্য এখানে একজন কাট্টা কাফির, কট্টর নাস্তিক ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী নির্বোধও প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। সুতরাং ইসলামের শুরা ব্যবস্থার সাথে গণতান্ত্রিক সিস্টেমের পার্থক্য আকাশ-পাতাল।

৩. শুরা মজলিস আমির বা খলিফাকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে না। প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে এবং অন্য সদস্যদের তুলনায় কারও মতকে অধিক সঠিক মনে করায় তিনি কখনো শুরা সদস্যদের একজনের মতকেও প্রাধান্য দিতে পারেন। এর বিপরীত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত জাতির জন্য অবশ্যপালনীয় আইনে পরিণত হয়ে যায়। বিষয়টি যদি সার্বিক বিবেচনায় অকল্যাণকর ও জাতির জন্য ক্ষতিকরও হয় তবুও এখানে রাষ্ট্রপ্রধানের বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ থাকে না।

যখন এটা জানা হলো তখন মুসলিমদের জন্য কর্তব্য হলো, স্বীয় দ্বীনের ওপর গর্ব করা, স্বীয় রবের শাশ্বত বিধি-বিধানের ব্যাপারে এ আস্থা রাখা যে, তা তাদের দ্বীন ও দুনিয়াকে কল্যাণময় করবে। পাশাপাশি তাদের জন্য এটাও অপরিহার্য যে, আল্লাহর

শরিয়তবিরোধী সকল তন্ত্র-মন্ত্র থেকে দূরে থাকা। আর শাসক হোক বা শাসিত, সকল মুসলিমের জন্য অবশ্যকরণীয় হলো, ব্যক্তি হোক বা পরিবার, সমাজ হোক বা রাষ্ট্র—জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আল্লাহর শরিয়তকে আঁকড়ে ধরা। কারও জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মত বা পথকে নিজের জন্য গ্রহণ করবে। আর আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নবি হিসেবে মেনে সন্তুষ্ট থাকার দাবি হলো, মুসলিমরা ইসলামকে প্রকাশ্যে ও আন্তরিকভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং আল্লাহর শরিয়তকে বড় মেনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর অনুসরণ করে চলবে।

আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করেন এবং ইসলামের শত্রু ও মুনাফিকদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেন। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

ভোট, নির্বাচন, শুরা ও খিলাফাহ : বিশ্লেষণ ও বিধান

ইসলাম ও গণতন্ত্র—দুটি বিপরীতমুখী জীবনব্যবস্থা। দুটির অবস্থান দুই মেরুতে। এ দুটি জীবনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দুটি অনুষঙ্গ হলো, শুরাব্যবস্থা ও নির্বাচন। যার একটি ইমান ও হক এবং অপরটি কুফর ও বাতিল। ইসলামি শুরাব্যবস্থা হলো ইসলামি নিয়মে মুসলিম জাহানের খলিফা নির্ধারণের শরিয়া-নির্ধারিত একটি পদ্ধতি। আর গণতান্ত্রিক নির্বাচন হলো সার্বভৌমত্বের দাবিদার ও আইন প্রণয়নকারী জনপ্রতিনিধি নির্ধারণের একটি পদ্ধতি। একটি হলো শারিয়াহ-অনুমোদিত ইসলামি ব্যবস্থার অংশ, আর অন্যটি হলো মানবরচিত কুফরি ব্যবস্থার অনুষঙ্গ। একটি হলো আর-রহমানের পথ, আর অপরটি হলো বিতাড়িত শয়তানের পথ।

সংজ্ঞা ও পরিচয় : 'নির্বাচন হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক কাজের জন্য একজন প্রতিনিধিকে বেছে নেয়।' ("Election (political science)" Encyclopedia Britannica Online. Accessed August 18, 2009)

অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন-যাপনের পদ্ধতি প্রণয়ন, তাদের সকল সংকট-সমস্যার বিচারকরণ, তাদেরকে পরিচালনার উদ্দেশ্যে শাসক নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া। প্রকৃত অর্থে নির্বাচন হলো, জনগণ নিজেদের জন্যে বিধানদাতা, জীবনব্যবস্থা প্রণেতা ও আনুগত্য করার জন্য কোনো উপাস্যকে বাছাই করার প্রক্রিয়া।

নির্বাচনের সূচনা :

নির্বাচন সম্পর্কে Encyclopedia man, myth's magic- এ বলা হয়েছে : Election, the word derived from the Greek word eloge (choice).The idea is basic to the traditional structure of Christian theology.

অর্থাৎ 'নির্বাচন' শব্দটি উৎসরিত হয়েছে গ্রীক শব্দ Eloge হতে, যার অর্থ হলো পছন্দ। নির্বাচনের ধারণা প্রাচীন খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের ঐতিহ্যগত কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রাচীন কালে নির্বাচন : প্রাচীন কাল থেকেই গ্রিস ও রোমে নির্বাচন পদ্ধতি ব্যবহার হয়ে আসছে এবং গোটা মধ্যযুগে রোমান সম্রাট ও পোপের মতো ধর্মীয় নেতা বাছাই করতেও নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো। ("Election (political science)," Encyclopedia Britannica Online. Accessed August 18, 2009)

প্রাচীন ভারতে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজারা তাদের রাজা নিযুক্ত করত। বাংলার মধ্যযুগের গোড়ার দিকে পাল রাজাদের মধ্যে গোপালকে রাজা নিযুক্ত করতে নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। (History of Buddhism in India, Translation: A. Shiefner.)

আধুনিক কালে নির্বাচন : সপ্তদশ শতাব্দির দিকে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের চিন্তাধারা শুরু হয়। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের সংস্কৃতিতে প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছিল পুরুষরাই। নির্বাচকমণ্ডলীতেও তাই এদেরই প্রাধান্য থাকত।

অন্যান্য বহু দেশেও একই ধারা চলে আসছিল। গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতেও শুরুর দিকের নির্বাচনে জমিদার অথবা শাসক শ্রেণির পুরুষদের প্রাধান্য ছিল। ১৯২০ সাল পর্যন্ত অবশ্য পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত দেশে এবং উত্তর আমেরিকায় শুধু পুরুষদেরই ভোটাধিকার চালু ছিল। এর পর থেকেই বিভিন্ন দেশে মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়ার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ১৮৩২ সালে প্রথম সংস্কার আইনে সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে ১৮৬৭ সালে কারখানার শ্রমিকদের, ১৮৮৪ সালে কৃষি মজুরদের, ১৯১৮ সালে সীমিত সংখ্যক নারীদের এবং ১৯২৮ সালে সকল নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়।

এ ব্যবস্থায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত দরিদ্র মানুষ, দিনমজুর ও নারীদেরকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি। অথচ বর্তমানে একজনের নির্বাচন অধিকার না থাকা তাদের দৃষ্টিতেও নিন্দনীয়! এভাবে মানব মস্তিষ্ক থেকে নির্গত এসব ফয়সালা একসময় তারা নিজেরাই বদলাতে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানবরচিত আইন-কানুন অপূর্ণাঙ্গতার কারণে কিছু দিন পরপরই পাল্টায়। আর তাই এটা কখনো প্রকৃত জীবনব্যবস্থা হতে পারে না।

গণতন্ত্র খ্রিষ্টানদের বানানো একটি তন্ত্র : গণতন্ত্র যে খ্রিষ্টানদের বানানো একটি জীবনব্যবস্থা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। "Man, Myth & magic" গ্রন্থে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে :

”However that the doctrine of election found its most notable expression in Christianity.”

অর্থাৎ যাই হোক, নির্বাচনের এ মতবাদটির উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তি খ্রিষ্টানদের (বিকৃত) ধর্মতত্ত্বের মাঝে পাওয়া যায়।

নির্বাচন ও শুরাব্যবস্থা কি এক?

এটা স্বীকৃত ও সন্দেহাতীত বিষয় যে, ইসলাম ও গণতন্ত্র দুটি ভিন্ন জীবনব্যবস্থা, দুটি আলাদা দ্বীন। তেমনই ইসলামের শুরাব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি দুটিও ভিন্ন। অনেকেই মনে করেন, শুরাব্যবস্থা মানে একজন মুসলিমের মতামত গ্রহণ। অতএব যদি কোনো মুসলিম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেয় তাহলে তার এ ভোট প্রদান অনেকটা শুরাব্যবস্থারই অনুরূপ। কিন্তু মূলত ব্যাপারটি তা নয়। বোঝার সুবিধার্থে আমরা এখানে একটি উদাহরণ পেশ করছি।

মনে করুন, কারও টেবিলের ওপর সুন্দর মলাটবদ্ধ দুটি বই আছে। এখন প্রথম বইটি খুলে দেখা গেলো, তা আল্লাহর তাআলার অবতীর্ণকৃত ‘আল-কুরআন’। আর দ্বিতীয় বইটি খুলে দেখা গেল, তা কালমার্ক্সের রচিত ‘দ্যা ক্যাপিটাল’। এখন কথা হচ্ছে, দুটি বই-ই সুন্দর মলাটে বাঁধাইকৃত, দুটি বই-ই কাগজের এবং দুটি বই-ই কালো কালিতে লেখা। এখন আংশিক এ সাদৃশ্যের কারণে কি বই দুটিকে একই মানের বলা যাবে? দুটিকে কি একই বা কাছাকাছি স্তরের বলার কোনো অবকাশ আছে। নাউযুবিল্লাহ! যে উভয়টিকে একই বা কাছাকাছি স্তরের বলে বিশ্বাস করবে, নিশ্চয়ই তার ইমান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। হয় সে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য সম্পর্কে অজ্ঞ, নয়তো সে দ্বীন ও শরিয়ত নিয়ে ঠাট্টাকারী।

আবার অনেকেই গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে থাকেন। এজন্য তারা জনগণকে ইসলামি গণতন্ত্রের দাবিদার কোনো দলকে ভোটদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। এবার আমরা আগের মতো আরেকটি বাস্তব উদাহরণ দেখি। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে ইসলামকে অন্যান্য বাতিল ধর্মের ওপর বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে। কুরআনের মাঝে দ্বীনকে বিজয়ী করার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া আছে। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীতেও রয়েছে এর প্রায়োগিক উদাহরণ। এখন আমরা উপরিউক্ত উদাহরণের মতোই এখানে আরেকটি প্রশ্ন করতে পারি যে, কালমার্ক্স রচিত ‘দ্যা ক্যাপিটাল’ও তো একটি জীবনব্যবস্থা। এখন কোনো দল যদি এটা দিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে কি তা সম্ভব? উত্তর হবে, অবশ্যই না। তাহলে অহেতুক কেন আমরা কুরআনি নির্দেশনা ও নববি আদর্শের বাইরে গিয়ে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করছি, যা পুরোপুরিই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক? এটা কি আগুন ও পানিকে একসাথে রাখার মতো ব্যাপার নয়? নাকি আমরা প্রকারান্তরে এটা বলতে চাচ্ছি যে, ইসলাম

আমাদেরকে এমন একটি অপূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছে, যেখানে কুফরি তন্ত্রের আশ্রয় নেওয়া ব্যতীত ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়? নাউজুবিল্লাহ!

এটা ঠিক যে, ইসলামে বিশেষ অপারগ হালতে ও একান্ত নিরূপায় অবস্থায় ব্যক্তির জন্য কুফরি কথা উচ্চারণ করার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু যুগের পর যুগ ধরে পুরো মুসলিম উম্মাহকে কুফরি তন্ত্রের মডেলে চলতে হবে, এটা কেমন ওজর? এটা কি আদৌ বিশেষ অপারগ অবস্থায় কুফরি কথা বলার মতো ব্যাপার? কুরআনে বিশেষ যে অপারগ অবস্থায় কুফরি কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেটা একে তো একান্ত বাধ্য হয়ে নিরূপায় হলে, যেখানে প্রাণ বা অঙ্গহানির প্রবল আশঙ্কা থাকে, দ্বিতীয়ত এটা হলো সাময়িক, দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ী কোনো অনুমোদন নয়, তৃতীয়ত তা কেবল একান্ত বাধ্য ও অপারগ ব্যক্তিবিশেষের জন্য, একসাথে সমগ্র উম্মাহর জন্য নয়, চতুর্থত এটা শুধু কথার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, এখানে কুফরি কাজের অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিষয়গুলো বিজ্ঞ আলিমদের অজানা নয়।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, এই যে কুফরি সিস্টেমের অনুষঙ্গ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যর্থ প্রয়াস, এটা কি একান্ত নিরূপায় ও বাধ্য হয়ে করা হচ্ছে, যেখানে প্রাণ বা অঙ্গহানির প্রবল আশঙ্কা বিদ্যমান, নাকি নববি মানহাজের বিপরীতে হিকমাহ ও কৌশলের অজুহাতে কুফরি পদ্ধতির অনুগামী হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্ন এটা? দ্বিতীয়ত, যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় যে, কুফরি সিস্টেমে যাওয়াটা ছিল একান্ত অপারগতা ও বাধ্যতার শিকার হয়ে, তাহলে প্রশ্ন হলো এটা কি সাময়িক নাকি যুগ যুগ ধরে চলে আসা দীর্ঘমেয়াদি কর্মপন্থা? প্রায় শত বছর হতে চলল এ ধারার মেহনত, কিন্তু আজ পর্যন্ত কি আল্লাহর জমিনের কোথাও ইসলাম প্রতিষ্ঠার নজির দেখানো গেছে? বস্তুত সহস্র বছর চলে গেলেও এ সিস্টেমে কোনোদিন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না। তিক্ত এ সত্য মানুষ যত আগে বুঝবে, উম্মাহর জন্য ততই কল্যাণ। তৃতীয়ত, কুফরে লিপ্ত হওয়ার অপারগতা তো বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ দলের কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তাআলা পুরো দুনিয়ার সকল মুসলিমকে এমন অপারগ অবস্থায় ফেলবেন যে, সমগ্র উম্মাহ যুগ যুগ ধরে শতাব্দিকাল পর্যন্ত কুফরে লিপ্ত থাকতে বাধ্য থাকবে। এটা মূলত অপারগতা নয়; বরং নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেওয়া জুলুমের বোঝা। নয়তো যারা নববি মানহাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করছে তারা ঠিকই বিশ্ববাসীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, কুফরি ব্যবস্থার অংশ না হয়ে নববি মানহাজের ওপর চললে আজকের যুগেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। চতুর্থত, কুরআনে একান্ত নিরূপায় ও বিশেষ অপারগ অবস্থায় অন্তরে ইমান ঠিক রাখার শর্তে মুখে কেবল কুফরি কথা উচ্চারণের অনুমতি দিয়েছে, কুফরি কর্মের নয়। অথচ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মতো কুফরি পদ্ধতিতে শুধু কুফরি কথারই স্বীকৃতি দিতে হয় না; বরং অনেক কুফরি কর্মেরও অংশীদার হতে হয়। এছাড়াও এতে আরও অনেক শারয়ি সমস্যা ও আপত্তি রয়েছে, যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে কলেবর অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। এত এতে সমস্যা থাকার পরেও এটা কী করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার অনুমোদিত পন্থা হতে পারে? পূর্বের একদল আলিম তো এটাকে স্রেফ একটি অপারগতাবশত কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে অনেকে এটাকে আর কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নয়; বরং তারা এখন এটাকে নিজেদের আকিদার অংশ বানিয়ে নিয়েছে, যা তাদের বক্তব্য, আচার-আচরণ ও কর্মপন্থায় পরিষ্কারভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

ভোট কি শুরাব্যবস্থা?

বর্তমানে একদল আলিম গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভোট পদ্ধতিকে ইসলামি শুরাব্যবস্থার প্রতিরূপ বলে থাকেন। তারা সাধারণ মুসলিমদেরকে এ আয়াত থেকে দলিল দিয়ে থাকেন :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারদের নিকট পৌঁছে দাও।’ [সুরা আন-নিসা : ৫৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তারা বলেন, ভোট যেহেতু একটি মতামত ও পরামর্শ, তাই এটিও একটি আমানত। আর তাই এ আমানত তার হকদার বা উপযুক্ত প্রাপকের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। অর্থাৎ যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, তাদেরকে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে আমানতকে যথাযথ স্থানে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আসুন, আমরা নিম্নোক্ত আলোচনায় দেখার চেষ্টা করি, শরিয়তের আলোকে ভোট কি আদৌ সাধারণ মতামত নাকি ভিন্ন কিছু?

ভোট ও শুরার মধ্যকার মৌলিক কিছু পার্থক্য : প্রথমত, ইসলামে শুরাব্যবস্থা হলো মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ, যা খলিফার জন্য মানা বা না মানা উভয়টির অবকাশ আছে। খলিফার জন্য এটাকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা জরুরি নয়। এমনকি খলিফা ভালো ও কল্যাণকর মনে করলে শুরার অধিকাংশ সদস্যের পরামর্শের বিপরীতে ভিন্ন সিদ্ধান্তও দিতে পারেন। কিন্তু ভোটের ক্ষেত্রে অধিকাংশের রায়কে প্রত্যাখ্যান করা যায় না; বরং আইন অনুসারে বাধ্যতামূলকভাবে তা মেনে নিতে হয়।

দ্বিতীয়ত, ইসলামে শুরার সদস্যদের ইলম, বুদ্ধিমত্তা, আমানতদারি, কল্যাণকামিতা ও তাকওয়াসহ বিশেষ গুণাবলির অধিকারী হতে হয়। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই ভোট দেওয়ার অধিকার সমান। এমনকি গণতান্ত্রিক সিস্টেমে একজন দেশসেরা বিজ্ঞ লোকের মতামত ও দেশের সবচেয়ে অশিক্ষিত লোকের মতামতের মান বরাবর। একজন মুসলিমের ভোট ও একজন কাফিরের ভোট উভয়টির দাম সমান। কেননা, গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিতে কেবল সংখ্যাই মুখ্য, ব্যক্তির যোগ্যতা বা বৈশিষ্ট্যের কোনো মূল্যায়ন নেই।

তৃতীয়ত, শরিয়তের দৃষ্টিতে কাফিররা মুসলিমদের কোনো বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে না। মুসলিমদের ওপর কাফিরদের কোনো কর্তৃত্ব চলতে পারে না। এটা কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা। কিন্তু গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভোটাধিকার কাফিরদেকে মুসলিমদের সমান সুযোগ করে দেয়। এ সিস্টেমে তাদেরকে বাদ দেওয়ার কোনোই সুযোগ নেই। তাদেরকে বাদ দেওয়ার আইন করলে সেটা আর গণতন্ত্র থাকবে না। আর এমনটা করলে গণতন্ত্রের প্রভু ও পূজারীরা তা কোনোদিন বাস্তবায়িতও হতে দেবে না।

ভোটকে শুরা বলে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মুসলিমদের অবস্থা : প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী হবার সবচেয়ে সহজ কৌশল হলো, Divide & Rule (জাতিকে বিভক্ত করে দাও, অতঃপর নির্বিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনা করো) মূলনীতির প্রয়োগ। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ দেশের অল্পকিছু মানুষই ইসলামি দলগুলোর সমর্থক। অতঃপর বহুদলীয় গণতন্ত্রের ফর্মুলায় এই অল্প সংখ্যক মানুষের ভোট আবার ভাগ হবে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত ইসলামি দলগুলোর মাঝে। একদল থেকে কোনো মাওলানা বা মুফতি দাঁড়াবে, অনুরূপ অপরদলেও দাঁড়াবে মাওলানা বা মুফতি। অতঃপর ইসলামি দলগুলোর সমর্থকদের মাঝে শুরু হবে নোংরা কাঁদা ছোড়াছুড়ি, গিবত, অপবাদ ও পরনিন্দার বৃষ্টিধারা। দূর থেকে সেক্যুলার-বামপন্থীরা মজা লুটবে। ওদিকে তারা তো দলীয়ভাবে শক্ত অবস্থান নিয়ে তাদের এ বিভেদের ফায়েদা পুরোটাই তুলে নেবে।

আসলে গণতান্ত্রিক নির্বাচন এই উম্মাহর মাঝে বিভেদ ও অনৈক্যের বিষফোঁড়া রোপণ করে দিয়েছে, যার ফল আমরা আজ নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশে বর্তমানে ইসলামি রাজনীতিক দলের সংখ্যা প্রায় বিশেরও অধিক, যারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে ভোট পাওয়ার হকদার বলে দাবি করছে। অনেকে তো ইসলামপ্রিয় জনগণের ভোট পাওয়ার আশায় ইসলাম ও কুরআন-সুন্নাহর বিকৃতি ঘটাতেও কোনো কার্পণ্য করে না। সুউচ্চ কণ্ঠে জোর গলায় দাবি করে যে, তাদের প্রতীকে ভোট দেওয়া মানে আল্লাহ ও রাসুলকে ভোট দেওয়া। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। এই হলো গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার করতে চাওয়া দলের অবস্থা।

নির্বাচনের মুলো ঝুলিয়ে মুসলিমদের ইমান ও শাসন চুরি : তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল দেশগুলোর গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভিনদেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ একটি ওপেন সিক্রেট। এসব দেশের প্রতিটা ইলেকশনের পূর্বে বিভিন্ন নেতা-নেত্রীদের আঞ্চলিক পরাশক্তি বা বৈশ্বিক পরাশক্তি দেশগুলোর রাজধানী অভিমুখে দৌড়াদৌড়ি এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওইসব দেশ থেকেই নির্ধারন করা হয়ে থাকে, আগামী পাঁচ বছর কারা এদেশে তাদের গোলাম হিসেবে ও স্বার্থ উদ্ধারে কাজ করবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর আসলে এক্ষেত্রে তেমন কিছুই করার থাকে না। আর গণতন্ত্রের তথাকথিত 'সকল ক্ষমতার উৎস' জনগণের তো এক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। এমনকি প্রভাবশালী শক্তির বিপরীতে তাদের দু'একটি ফাঁকা বুলি উচ্চারণ করার সাহসও থাকে না।

পরিশেষে, মুসলিম জনগণের সামনে নির্বাচনের মুলো ঝুলিয়ে প্রথমে তাদেরকে দুধের নামে ঘোল খাওয়ানো হয়। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, দূরের মরীচিকাকে সুমিষ্ট পানি বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। আর ইসলামি দলগুলো যুগ যুগ ধরে মানুষকে নববি মানহাজের পথ পরিত্যাগ করে এ কুফরি ব্যবস্থার জালেই আটকা পড়ে আছে। উল্টো একদল মুর্খ আগ বাড়িয়ে নববি মানহাজকে সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দিয়ে দুনিয়ার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ ফলাফল এটাই হয় যে, তারা না দুনিয়ার সরকারের সুনজর পায় আর না আরশের অধিপতির সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়। অতঃপর নির্বাচনের পরদিন দেখা যায়, গণতন্ত্রের প্রভুরা তাদেরই একজন বিশ্বস্ত গোলামকে সরকারপ্রধান করে বসিয়ে দেয়। ব্যস, এখন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মডারেট মুসলিম না ঘরকা আর ঘাটকা। না তারা আল্লাহর হতে পারে, আর না গণতান্ত্রিক প্রভুদের আস্থাভাজন হতে পারে।

নববি দাওয়াত বনাম গণতন্ত্রের দাওয়াত : আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর মূলনীতি মানুষের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করে দিয়েছিলেন। তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ যা দেন সেটাই আইন। এটা বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়াটা হলো ইমান আর না মানাটা হলো কুফর। তাদেরকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তোমাদের কাজ হলো আল্লাহর আইন ও তাঁর সার্বভৌমত্বকে মেনে যাওয়া। ভোটের মাধ্যমে, পরামর্শের মাধ্যমে, অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাইয়ের কোনো অধিকার তোমাদের নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا.

'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের (ভিন্ন আরেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের) কোনো অধিকার নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হবে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে।' [সুরা আল-আহজাব : ৩৬]

অন্যদিকে আজকের গণতন্ত্রবাদীরা মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছে যে, তোমাদের যাচাই-বাছাই করার সুযোগ আছে। হে জনগণ, তোমরাই সব এবং তোমরাই রব (প্রভু)। সকল বিষয়ে তোমরা মুক্ত স্বাধীন। চাইলে যেকোনো কিছুকে তোমরা আইনে পরিণত করতে পারো। চাইলে তোমাদের যেকোনো সুবিধাকে অনুমোদিত ও বৈধ বানাতে পারো। তোমরা চাইলে শাহবাগীদের ভোট দিয়ে সমকামিতা বৈধ করতে পারো, আবার চাইলে ইসলামপন্থীদের ভোট দিয়ে মদ-যিনা সব নিষিদ্ধ করতে পারো। তোমরা যেটা চাইবে সেটাই হবে। দয়া করে ভোটটা আমাদের দাও; তাহলে আমরা অধিকাংশ মানুষের রায় নিয়ে সকল হারামকে নিষিদ্ধ করব এবং সকল হালালকে অনুমোদিত করব।

এভাবেই আল্লাহর বিধান হোক হোক বা শয়তানের আইন হোক, সবকিছুর বাস্তবায়ন নির্ভর করছে অধিকাংশ মানুষের রায়ের ওপর। তারা যেটার পক্ষে ভোট দেবে, সেটাই ফাইনাল, সেটাই চূড়ান্ত। মোটকথা, আল্লাহ বিধান বাস্তবায়নের বিষয়টিও নির্ভর করছে জনগণ নামক প্রভুদের অনুমোদনের ওপর। ওহ! কত বড় স্পর্ধা!! কত বড় দুঃসাহস!!! আল্লাহর সৃষ্টজীব হয়ে আল্লাহর আইনের বাস্তবায়নের জন্য অধিকাংশের রায়ের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে, এরচেয়ে বড় আল্লাহদ্রোহ এবং এর চেয়ে বড় কুফর আর কী হতে পারে? পাঠক, বিষয়টি কি চিন্তা করে দেখেছেন কখনো, কত জঘন্য এ ব্যবস্থা, যেখানে আল্লাহর বিধানকে তাঁরই গোলামরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে? নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। খারাপ লাগলেও বাস্তবতা এটাই যে, এসব তিক্ত সত্য ইসলামি দলগুলো তাদের সমর্থক ও সাধারণ জনগণকে জানায় না, জানাতে চায় না। উল্টো কেউ যদি এসব হাকিকত তুলে ধরে, ইসলামের মূল দর্শন ফুটিয়ে তোলে তখন দালিলিক খণ্ডন না করে উল্টো তারা তাকে শত্রু জ্ঞান করে; এমনকি কিছু মানুষ তার ক্ষতিসাধনেরও চেষ্টা করে। আল্লাহর কাছে আমরা এদের থেকে এবং এদের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই।

ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বাচন : নির্বাচন হচ্ছে একটি মাধ্যম। এটার বৈধতা-অবৈধতার বিধান নির্ভর করছে, এটা কীসের মাধ্যম এবং কী হতে উৎসারিত এই মাধ্যম, তা জানার ওপর। এটা যদি বৈধ ব্যবস্থার মাধ্যম হয় তাহলে তা বৈধ, যদি হারাম ব্যবস্থার মাধ্যম হয় তাহলে তা হারাম, আর যদি কুফরি ব্যবস্থার মাধ্যম হয় তাহলে তা কুফর।

আমরা যে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হলো, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম শাখা, যা জনগণকে সিয়াদাহ তথা সার্বভৌম, কর্তৃত্ব, হুকুম, নিয়ন্ত্রণ, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও বিধান নির্ধারণের অধিকার দান করে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সিয়াদাহ হচ্ছে সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব। আর গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সিয়াদাহ সাব্যস্ত করা হয় এমন সব মানুষের জন্য, যারা নির্বাচিত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে যা খুশি তা-ই প্রণয়ন করতে পারে। অথচ যা-খুশি তার করার উপযুক্ত সিয়াদাহ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার অধিকার, এতে অন্য কারও অংশীদারত্ব নেই। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জনগণের পক্ষ থেকে জনপ্রতিনিধিদের কাঁধে অর্পিত এই সিয়াদাহ হতেই উৎসারিত হয় আইন প্রণয়নের অধিকার। এর মাধ্যমেই তাদের হাতে চলে আসে আইন-কানুন পরিবর্তন-পরিমার্জনের কর্তৃত্ব, বিচারে-আচারের কর্তৃত্ব, অতঃপর তা কার্যে পরিণত করার কর্তৃত্ব। আর তারা বলে, এগুলো গণমানুষের ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে হতে হবে। অধিকাংশ মানুষ যা চায় এবং সমর্থন করে তা-ই সবার জন্য অবশ্যপালনীয় আইন হিসেবে গৃহীত হবে।

গণতন্ত্রের মূল বুনিয়াদ হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর নির্ভরশীলতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদ যেটা বলবে, সেটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার হচ্ছে শাসন করা, আইন প্রণয়ন করা, আইন কার্যকর করা এবং সিদ্ধান্তগুলো পরিচালনা করা। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। সুতরাং আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, গণতান্ত্রিক নির্বাচন মূলত 'সিয়াদাহ' এর অর্থকেই প্রতিনিধিত্ব করে। এ হিসেবে গণতান্ত্রিক নির্বাচন হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন। প্রশ্ন হলো, কীভাবে মানুষের ইচ্ছা জানা যাবে? এ প্রশ্নের জবাবে তারা বলে, নির্বাচন এবং ভোটদানের মাধ্যমে।

সুতরাং ভোটদান হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার কথা জানানোর একটি মাধ্যম, যেখানে তাদের নিজেদের অধিকার থাকবে আইন প্রণয়নের। যে সংসদীয় ব্যবস্থায় বর্তমানে আমরা আছি, এই সংসদ এমন একটি কেন্দ্র, যেখান থেকে অনেক কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে প্রথম হচ্ছে আইন প্রণয়ন। অন্য কথায় বলতে গেলে, আইন প্রণয়নের অর্থ কোনো কিছুকে হালাল মোড়ক দেওয়া অথবা কোনো কিছুর নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া। আইন প্রণয়নের মানে কোনো কিছুকে হালাল ঘোষণা করা এবং তার নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া অথবা কোনো কিছুকে হারাম ঘোষণা করা এবং তার অনুমতি ছিনিয়ে নেওয়া। অথচ এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার অধিকার। তাদের এই নীতি আল্লাহর তাআলার উলুহিয়্যাত ও প্রভুত্বের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। আসমান-জমিনের সকল কিছুই যেহেতু আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট, সেহেতু সকল ক্ষেত্রে উলুহিয়্যাত ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। সবকিছুতে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব একমাত্র রাব্বুল আলামিনেরই। আর যিনি ইলাহ, তিনিই একমাত্র আইন ও বিধান দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। কুরআনে এসংক্রান্ত অনেক সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে।

এখন আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে মূলত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকে আইন প্রণয়নের পূর্ণাঙ্গ অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়। এ হিসেবে নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অর্থ হবে নিজেদের 'সাইয়িদ' নির্ধারণ করা। কোনো মুসলিমের এ ব্যাপারে ন্যূনতম সংশয় থাকার অবকাশ নেই যে, আল্লাহ তায়ালা হলেন প্রকৃত 'আস-সাইয়্যিদ' (السيد) এবং প্রকৃত 'আল-মুতা' (المطاع)। 'আস-সাইয়্যিদ' হলো, যার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ওপর কখনো প্রশ্ন তোলা যায় না। আর 'আল-মুতা' হলো, যার আদেশ কখনো অমান্য করা যায় না।

সুতরাং সার্বিক দিক বিবেচনায় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অর্থ দাঁড়াচ্ছে- কোনো কিছুকে হালাল এবং হারাম ঘোষণার ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের জন্য আমার ইচ্ছার প্রতিফলনে একজন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা। আর এটা সুস্পষ্ট যে, তা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর প্রকৃত মর্মের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক এবং সেই মুসলিমের ইচ্ছার সাথেও সাংঘর্ষিক যে বলে, আমি নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে উপস্থাপন করেছি। অন্য কথায়, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আমি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে গ্রহণ করি না, আমি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে আইনদাতা হিসেবে গ্রহণ করি না এবং আমি আল্লাহ তাআলার

বিধিনিষেধের বিপরীতে আমার ওপর কোনো শাসকের বানানো বিধিনিষেধ গ্রহণ করি না। এ অর্থে গণতান্ত্রিক শাসক বলতে সে নয়, যে শাসন করে; বরং এখানে শাসক বলতে নির্দিষ্টভাবে তাকে বুঝানো হয়, যে সব ধরনের আইন প্রণয়নের অধিকার রাখে; যদিও তা শরিয়ার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক হোক। মোটকথা হাকিমিয়্যাহ বা কর্তৃত্ব কেবল নির্বাচিত শাসকের জন্যই সাব্যস্ত করা হয়, যা ছিল একমাত্র আল্লাহ তাআলার অধিকার। যে গুণটি একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ সেটিকে কোনো মানুষের জন্যে সাব্যস্ত করে থাকে। সে হিসেবে বলা যায়, নির্বাচনের মাধ্যমে তারা আল্লাহর পরিবর্তে ভিন্ন সত্তাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করছে। সুতরাং এটা শিরক বৈ অন্য কিছু নয়।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বা ভোট প্রদানকারী কি কাফির?

এক্ষেত্রে এক কথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়; বরং বিভিন্ন দিক বিবেচনায় এদেরকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমত, যারা সত্যিকার অর্থেই গণতন্ত্র ও তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং ইসলাম ও শারিয়ার বিরুদ্ধে গেলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়কেই চূড়ান্ত আইন বলে বিশ্বাস করে, এরা প্রকৃত অর্থেই কাফির; যদিও তাদের নাম মুসলিম হোক এবং তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করুক।

দ্বিতীয়ত, যারা গণতন্ত্র ও ইসলামের মাঝে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে, সে ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বা ভোট প্রদান করে, আর সামগ্রিক দিক বিবেচনায় তাদের অজ্ঞতা যদি শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় তাহলে এরা কাফির হবে না।

তৃতীয়ত, যারা বিভিন্ন আলিমের অনুসরণে কিংবা দাঈদের ভুল প্রচারণার শিকার হয়ে এতে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু তাদের অন্তরে থাকে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠা করা; যদিও তা ভুল পদ্ধতিতে হোক, তাদের ক্ষেত্রেও এক ধরনের ওজর থাকায় এরা কাফির হবে না।

চতুর্থত, গণতন্ত্রকে কুফরি ব্যবস্থা হিসেবে অন্তরে বিশ্বাস করে, কিন্তু এটাকে স্রেফ একটা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে ক্ষমতায় গিয়ে গণতান্ত্রিক সিস্টেমকে উৎখাত করে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এতে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে তাবিলের আশ্রয় নেওয়ায় এরা কাফির হবে না।

সারকথা হলো, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন হলো একটি কুফরি ব্যবস্থা। ইকরাহ বা বাধ্যবাধকতা পাওয়া না গেলে কারও জন্য কুফরি বাক্য উচ্চারণ করার অনুমতি নেই। আর ইকরাহ পাওয়া যাক বা না যাক, কুফরি কর্ম কখনোই করার অনুমতি নেই। এ ব্যাপারে আমরা অষ্টম পর্বে সবিস্তরে দলিল-প্রমাণ ও উসুলের আলোকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। যাই হোক, এটা কুফরি ব্যবস্থা হলেও এতে অংশগ্রহণ করলেই তাকে তাকফির বা কাফির সাব্যস্ত করা যাবে না। কেননা, তাকফিরের জন্য কুফর পাওয়ার পাশাপাশি তাকফিরের প্রতিবন্ধকতাগুলোও না থাকা শর্ত। তাকফিরের প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো- ১. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরিয়তের বিধান তার কাছে না পৌঁছা। ২. শরিয়তের কোনো নসের ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল অনুধাবন। ৪. শরিয়তের ইলম পৌঁছেনি এমন দূর্গম অঞ্চলে বসবাস করা। ৩. নওমুসলিম হওয়া। ৫. অনিচ্ছাকৃত ভুল। ৬. ভুল ইজতিহাদ। সংক্ষেপে ছয়টি কারণ উল্লেখ করা হলো। এতে অনেক কথা ও ব্যাখ্যা আছে, যার বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। বিষয়গুলো স্পর্শকাতর, তাই বিজ্ঞ আলিম ছাড়া এ ব্যাপারে অন্যদের মন্তব্য করার অনুমতি নেই।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ ফলাফলে উপনীত হতে পারি যে, গণতন্ত্র ও তার অন্যতম অনুষঙ্গ নির্বাচন হলো কুফরি ব্যবস্থা। এটা কুফরি হওয়া নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। দলিল ও উসুলের আলোকে এটাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু বর্তমানে যেসব ইসলামি দল গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের আহবানে জনগণ ভোট প্রদান করে, তাদের ক্ষেত্রে তাকফিরের কোনো না কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকায় তাদেরকে কাফির বলার সুযোগ নেই। অনেকে গণতন্ত্রকে কুফরি ব্যবস্থা জানামাত্রই এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে গণহারে কাফির বলে থাকে। এটা মারাত্মক বিভ্রান্তিকর ও সম্পূর্ণরূপে ভুল ফতোয়া। গণহারে এমন তাকফির করা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর নীতি নয়। তাই এ ব্যাপারে আমাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা কাম্য।

আমরা শুধু গণতন্ত্র ও এর অন্যতম অনুসঙ্গ নির্বাচনের বিধান নিয়ে আলোচনা করছি। কারও ব্যাপারে বিস্তারিত জানা ব্যতীত শুধু নির্বাচনে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে আমরা কাউকে কাফির বলি না। কেউ আমাদের বিরুদ্ধে এমনটা দাবি করে থাকলে সেটা সুস্পষ্ট অপবাদ ও আমাদের ব্যাপারে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল। তাই সকল অপপ্রচার থেকে সতর্ক থাকা চাই।

খলিফা নির্ধারণ পদ্ধতি : আমরা যখন জানতে পারলাম যে, গণতান্ত্রিক নির্বাচন একটি কুফরি ব্যবস্থার অংশ এবং এটা স্বয়ং শিরকের একটি মাধ্যম, তাহলে ইসলামে খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধারণের পথ কী? খলিফা নির্ধারণের তিনটি স্বীকৃত পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে উম্মাহর ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে। এটাকে বলা হয় খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ। ইসলামি রাষ্ট্রের খলিফা নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতির যেকোনো একটির মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ক. ইখতিয়ার : ইখতিয়ার হলো, 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' এর পক্ষ থেকে মনোনীত বা নির্বাচিত হওয়া। উদাহরণত, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত। তাঁর খিলাফত সাকিফায়ে বনি সায়িদায় 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' এর মনোনয়ন ও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর সকল সাহাবি তাঁর খিলাফতের পক্ষে ঐকমত্য পোষণ করেন, তাঁর হাতে বাইআত হন এবং তাঁর খিলাফতের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

খ. ইসতিখলাফ : পূর্ববর্তী খলিফার নির্ধারণের মাধ্যমে পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করে যাওয়া। অর্থাৎ পূর্ববর্তী খলিফা সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে তাঁর পরবর্তী খলিফা হিসেবে নির্ধারণ করে দেবেন। যেমন, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত। তাঁর খিলাফত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্ধারণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছিল।

গ. শুরা : শুরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'-কে দায়িত্ব দেওয়া। তাদের দায়িত্ব হবে, তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করা। যেমন, উসমান বিন আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করার জন্য শীর্ষস্থানীয় ছয়জন সাহাবির সমন্বয়ে একটি শুরা কমিটি গঠন করেছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে আব্দুর রহমান বিন আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে যখন দেখলেন যে, বিজ্ঞ সাহাবি ও তাবিয়িরা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে খলিফা হিসাবে চাচ্ছেন, তখন তিনিই প্রথম তাঁর হাতে বাইআত হন। এরপর ছয়জনের অবশিষ্ট সাহাবিগণও তাঁর হাতে বাইআত হন। এরপর মুহাজির ও আনসার সাহাবাসহ অন্য লোকেরা তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/১৪৫-১৪৭, প্রকাশনী : দারুল ফিকর, বৈরূত]

এ তিনটি শারয়ি পদ্ধতিই হলো 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' বাস্তবায়িত হওয়ার পদ্ধতি। এছাড়াও আরেকটি পদ্ধতি আছে, যার মাধ্যমে খিলাফায় অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। তবে তা শারিয়াহ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থা নয়। সেটি হলো, তাগাল্লুব তথা শক্তি ও আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে। কেউ এ রকম পদ্ধতিতে খিলাফায় অধিষ্ঠিত হয়ে গেলে তাকেও খলিফা বলে গণ্য করা হবে। তবে সেটি 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' হবে না।

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّالِثُ، فَهُوَ الْقَهْرُ وَالِاسْتِيلَاءُ، فَإِذَا مَاتَ الْإِمَامُ، فَتَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ مَنْ جَمَعَ شَرَائِطَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِخْلَافٍ وَلَا بَيْعَةٍ، وَقَهَرَ النَّاسَ بِشَوْكَتِهِ وَجُنُودِهِ، انْعَقَدَتْ خِلَافَتُهُ لِيَنْتَظِمَ شَمْلُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَامِعًا لِلشَّرَائِطِ بِأَنْ كَانَ فَاسِقًا، أَوْ جَاهِلًا، فَوَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: انْعِقَادُهَا لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا بِفِعْلِهِ.

'তৃতীয় একটি পদ্ধতি হলো শক্তি ও আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে খলিফা হওয়া। সুতরাং খলিফা মারা যাওয়ার পর যদি খিলাফতের উপযুক্ত কেউ নিয়োগপ্রাপ্তি ও বাইআত গ্রহণ ছাড়াই ক্ষমতা ও সৈন্যবলে খিলাফতের দাবি করে এবং মানুষকে তা মেনে নিতে বাধ্য করে, তাহলে এতে তার খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে; যাতে মুসলিমদের শৃঙ্খলা ও ঐক্য বহাল থাকে। তবে সে যদি খিলাফতের উপযুক্ত না হয়ে থাকে; যেমন সে ফাসিক বা মূর্খ হয় তাহলে সে খলিফা হবে কি-না, এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী সে খলিফা বলে বিবেচিত হবে। এর কারণ আমরা যা পূর্বে উল্লেখ করেছি (অর্থাৎ যাতে

মুসলিমদের শৃঙ্খলা ও ঐক্য বহাল থাকে)। অবশ্য সে এর কারণে গুনাহগার হবে।' [রাওজাতুত তালিবিন : ১০/৪৬, প্রকাশনী : আল মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত]

এখান থেকে বর্তমান সময়ের মুসলিমদের করণীয় জানা যায়। সেটা হলো, বর্তমান যুগে যেহেতু 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' এর পদ্ধতিতে কোথাও খলিফা নেই, সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যারা যেকোনো কৌশলে বা ক্ষমতার জোরে শাসক হয়ে গেছে, তারা কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরিতে লিপ্ত কি-না। যদি তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট কুফরি না পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য করণীয় হলো, তাকে মেনে নেওয়া এবং আদেশ-নিষেধ মেনে চলা; যতক্ষণ না তা শারিয়াহর আইনের বিরুদ্ধে যায়। সুতরাং শারিয়াহ-বিরুদ্ধ কোনো আদেশ-নিষেধ করলে সেক্ষেত্রে তাকে আর মান্য করা যাবে না। আর যদি তার মধ্যে কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরি পাওয়া যায় তাহলে ক্ষমতা ও শক্তি থাকলে তাকে উৎখাত করে ন্যায়পরায়ণ কোনো শাসক নিযুক্ত করার চেষ্টা করা, আর সে শক্তি-সামর্থ্য না থাকলে ধৈর্য ধারণ করা এবং নিরবচ্ছিন্ন দাওয়াহ ও ইদাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া; যতদিন না শক্তি ও তামকিন অর্জিত হয়।

সহিহ মুসলিমে উবাদা বিন সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) আমাদেরকে ডাকলেন। অতঃপর আমরা তার হাতে বাইআত হলাম। তিনি আমাদের থেকে যে সকল বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিলেন তা হলো, আমাদের পছন্দে ও অপছন্দে, আমাদের সংকটে ও স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আমাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও আমরা (শাসকের কথা) শুনব ও মানব। আর আমরা শাসকের সাথে কর্তৃত্ব নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হবো না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফর দেখো, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ রয়েছে তাহলে ভিন্ন কথা।' [সহিহু মুসলিম : ৩/১৪৭০, হাদিস নং ১৭০৯, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত]

কুফরে বাওয়াহ হলো সুস্পষ্ট কুফর। তা এমন প্রকাশ্য কুফর, যা অন্য কোনো ব্যাখ্যা বা অর্থ পরিবর্তনের সম্ভাবনা রাখে না এবং যে ব্যাপারে কুরআন এবং সুন্নাহতে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। হাদিসের মর্মার্থ হলো, যদি শাসকের মাঝে কুফরে মুহতামাল তথা সন্দেহপূর্ণ কুফর পাওয়া যায়, যা স্পষ্ট কুফরের পর্যায়ে পড়ে না, যার বাহ্যিক অর্থ ছাড়াও ভিন্ন কোনো অর্থ বা ব্যাখ্যা হতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে শাসককে কাফির বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করা যাবে না। কারণ, শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তখনই উত্তোলন করা হবে, যখন সে সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হওয়ায় তাকে তাকফির করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। আর তাকে তাকফিরের মাধ্যমে যখন কাফির সাব্যস্ত করা হবে তখন যথাযথ শক্তি-সামর্থ্য থাকলে সে মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাকে অপসারণ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে।

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন :

قَوْلُهُ عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ أَيْ نَصُّ آيَةٍ أَوْ خَبَرٌ صَحِيحٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ مَا دَامَ فِعْلُهُمْ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী "যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ রয়েছে।" এর ব্যাখ্যা হলো, সেটা কুফর হওয়ার ব্যাপারে এমন কোনো আয়াত বা সহিহ হাদিস থাকা, যা ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। এ হাদিসের দাবি হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত শাসকদের কর্মকাণ্ড কুফর ভিন্ন অন্য ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ হবে না।' [ফাতহুল বারি : ১৩/৮, প্রকাশনী : দারুল মারিফা, বৈরূত]

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভোটার ও আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ : গণতন্ত্রে ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সকল লোকদের ভোটের মান সমান। এখানে মুর্খ ব্যক্তির ভোটের মান আর বড় বড় শিক্ষিত ও বিদ্বান লোকদের ভোটের মান একই। মানবরচিত এ সিস্টেমে সমাজের

একজন মূর্খ ও সর্বশেষ্ঠ জ্ঞানীর ভোটের একই মূল্য। অনুরূপ মুসলিম ও কাফিরের ভোটের একই মান। এদের কারও ভোট বা মতামতের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, এখানে সবাই সমান। কিন্তু ইসলামে এ পদ্ধতিটি অগ্রহণযোগ্য। শুরাব্যবস্থায় 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' এর নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আছে। যে-কেউ চাইলেই 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' হতে পারে না। তাই ইসলামে সকল জনগণের ভোটা বা মতামত নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কেননা, ইসলাম মতে কেবল জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' কারা?

আল্লামা ইবনু নুজাইম মিসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন :

أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ وَالرُّؤَسَاءِ.

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হলেন মুজতাহিদ (বিশেষজ্ঞ) উলামায়ে কিরাম ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।' [বাহরুর রায়িক : ৬/২৯৯, প্রকাশনী : দারুল কিতাবিল ইসলামি, বৈরুত]

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন :

أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ.

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হলেন উলামা, নেতৃত্বস্থানীয় ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ।' [মিনহাজুন তালিবিন : পৃ. ২৯২, প্রকাশনী : দারুল ফিকর, বৈরুত]

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' এর বৈশিষ্ট্যাবলী : 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত থাকা আবশ্যক।

১. ন্যায়পরায়ণতা : ফুকাহায়ে কিরাম ন্যায়পরায়ণতার যে সকল শর্ত বর্ণনা করেছেন, সেগুলো তার মাঝে বিদ্যমান থাকা। যেমন, প্রকাশ্য সব ধরনের কবিরা গুনাহ, হারাম ও মাকরুহে তাহরিমি ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

২. খলিফা হওয়ার শর্তগুলো জানা থাকা : উক্ত ব্যক্তির এতটুকু ইলম থাকা আবশ্যক, যার ভিত্তিতে তিনি বুঝতে পারবেন যে, খিলাফতের শর্তগুলোর ওপর ভিত্তি করে কে খলিফা হওয়ার যোগ্য আর কে অযোগ্য।

৩. রায় ও হিকমাহ : প্রজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের যোগ্যতা থাকা, যার মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি এমন একজন খলিফা নির্ধারণে সক্ষম হবেন, যিনি খিলাফতের সর্বাধিক যোগ্য এবং উম্মাহর কল্যাণে অধিক উপযুক্ত ও জ্ঞাত হবেন।

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আল্লামা মাওয়ারদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন :

فَأَمَّا أَهْلُ الِاخْتِيَارِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ الْجَامِعَةُ لِشُرُوطِهَا وَالثَّانِي: الْعِلْمُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا.وَالثَّالِثُ: الرَّأْيُ وَالْحِكْمَةُ الْمُؤَدِّيَانِ إِلَى اخْتِيَارِ مَنْ هُوَ لِلْإِمَامَةِ أَصْلَحُ، وَبِتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ أَقْوَمُ وَأَعْرَفُ

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ এর যোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথমত, পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা। দ্বিতীয়ত, এতটুকু ইলম থাকা আবশ্যক, যদ্বারা তিনি বুঝতে পারবেন, খিলাফতের শর্তগুলোর ভিত্তিতে কে খলিফা হওয়ার যোগ্য। তৃতীয়ত, সিদ্ধান্ত প্রদানের যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা থাকা, যার মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়, কে খলিফা হওয়ার উপযোগী এবং উম্মাহর কল্যাণ বিষয়ে অধিক উপযুক্ত ও সজাগ।' [আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা : পৃষ্ঠা নং ১৭-১৭, প্রকাশনী : দারুল হাদিস, কায়রো]

গণতন্ত্রান্ত্রিক ভোট ও নির্বাচনে ভোটারদের মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয় না। অনুরূপ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রেও ইসলামি নীতি-নৈতিকতা অনুসরণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এখানে সকলের মানই সমান। মানবরচিত এ ব্যবস্থায় মানুষ সামান্য টাকার লোভে পড়ে কিংবা প্রভাবশালী কোনো নেতার আদেশে কিংবা অস্ত্র ও হুমকির মুখে অধিকাংশ সময়ই

একজন বখাটে, সন্ত্রাসী বা অযোগ্য কাউকে নিজেদের নেতা বানায়। অন্যদিকে ইসলামি ব্যবস্থায় মুত্তাকি উমারা ও যোগ্য উলামার পরামর্শে সার্বিক দিক বিবেচনায় সবচেয়ে যোগ্য যিনি, তিনিই খলিফা নির্বাচিত হন। এ দুটি ব্যবস্থার মাঝে যে বিশাল তফাৎ, তা জ্ঞানবান মাত্রই বুঝতে সক্ষম। যারা বলে, নির্বাচন ও শুরাব্যবস্থা একই জিনিস, তারা যেন শুরাসদস্য হওয়ার যোগ্য 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলী এবং ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকদের মাঝে তুলনা করে দেখেন। এ বিশাল তফাৎ থাকার পরও নিছক গোঁড়া ও অন্ধ হলেই কেবল সে বলতে পারে, নির্বাচন ও শুরাব্যবস্থা এক।

আমাদের আলিমগণ; এমনকি সাধারণ মানুষেরাও এখন অকপটে এ কথা বলে বেড়ায় যে, ইহুদি-খ্রিষ্টানরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নীলনকশা করে এগুচ্ছে। তারা একশ বছর আগে একটি পরিকল্পনা করে। এরপর ধীরে ধীরে তা বাস্তবায়নের পথে এগোতে থাকে। মুসলিমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্র করার কথা বিশ্বাস করলেও তাদের অধিকাংশই যে আজ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রণীত সে নীলনকশায় পা দিয়ে ফেলেছে, সে ব্যাপারে তাদের অধিকাংশেরই কোনো খবরও নেই। বরং বেশিরভাগ মুসলিম তো অতিরিক্ত ঝামেলা এড়াতে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রণীত পদ্ধতিই আঁকড়ে ধরে নিজেদের জীবন পার করতে চাইছে। এমনকি অনেকে তো আগ বাড়িয়ে একে নেক ও পূণ্যের কাজ বলেও দাবি করছে। অনেকে ষড়যন্ত্র বলতে শুধু সাংস্কৃতিক ও চারিত্রিক অঙ্গনের বিপর্যয়ই বুঝে থাকে; অথচ আমল নষ্ট করার চাইতে আমাদের ঈমান-আকিদা নষ্ট করাই তাদের প্রধান টার্গেট। আমরা তাদের সাধারণ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত ও সচেতন হলেও তাদের প্রধান ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে এখনও অজ্ঞই রয়ে গেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের ইমান-আকিদা রক্ষা করুন এবং কাফিরদের সব ধরনের ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করে তা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন।

ইসলামি গণতন্ত্র : একটি ভুল চিন্তার অপনোদন

ইসলামি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত কিছু মানুষের ধারণা, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয় লাভ করার মাধ্যমে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে। কেননা, গণতান্ত্রিক আইনে যেহেতু অধিকাংশ সাংসদের ভোটে আইন পাশ করার বিধান রয়েছে, বিধায় সে আইন অনুসারে প্রথমে অধিকাংশ সাংসদের রায় নিয়ে বিদ্যমান সকল অনৈসলামিক আইন বাতিল করা হবে। এরপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদের ভোট নিয়ে সকল আইন ইসলামি শারিয়াহ অনুসারে তৈরি করা হবে। আর এভাবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

বস্তুত এটা মারাত্মক একটি ভুল চিন্তা। আল্লাহর আইনের সুউচ্চ মর্যাদা ও তার প্রকৃত গুরুত্ব না বোঝার কারণেই মূলত এমন ভ্রান্তিমূলক চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠই নয়; বরং সকল সাংসদ মিলেও যদি বিদ্যমান সিস্টেমে সকল আইন ইসলামি শারিয়াহ অনুসারে তৈরি করে তবুও তাকে ইসলাম প্রতিষ্ঠা বলা যাবে না। কারণ, এর মূলেই রয়েছে গলদ। তাই শাখা যতই ইসলামিকরণ হোক না কেন, সেটাকে কখনো ইসলাম প্রতিষ্ঠা বলা হবে না। যেমন কোনো ড্রামের পানি নিষ্কাশনের জায়গায় পঁচা ইদুর থাকলে উপর থেকে যত ভালো ও বিশুদ্ধ পানিই ঢালা হোক না কেন, সব পঁচা ও নোংরা পানিই বের হবে। ঠিক তেমনই গণতান্ত্রিক সিস্টেম ঠিক রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যতই শারয়ি আইন পাশ করিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলা হোক না কেন, তা কখনো ওই ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে না, যে ইসলাম আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চান।

অনেকে হয়তো এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংসদে শারয়ি আইন পাশ করানো হলে কেন সেটাকে ইসলাম প্রতিষ্ঠা বলা হবে না। বাহ্যত তো এটাকে ইসলামের বিজয়ই বলার কথা। কেননা, আল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাসী সকল মুসলিমই চায় যে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত হোক। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদের ভোটের মাধ্যমে যখন দেশের বিদ্যমান সকল অনৈসলামিক আইন বাতিল হয়ে শারয়ি আইন পাশ হবে তখন তো এটাকে ইসলামের বিজয় ও ইসলাম প্রতিষ্ঠাই বলতে হবে। কিন্তু আমরা এটাকে কেন ইসলাম প্রতিষ্ঠা বলে স্বীকার করছি না? কেন এটাকে ওই ইসলাম বলে মানছি না, যে ইসলাম আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চান? যাদের মনে এমন প্রশ্ন ও সংশয় উঁকি মারছে, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি :

গণতান্ত্রিক সংবিধানের নিয়ম হলো, কোনো আইন পাশ করাতে হলে প্রথমে আইনের খসড়া তৈরি করে সংসদে প্রস্তাব পেশ করা হয়। এরপর সাংসদদের হ্যাঁ-না ভোট নেওয়া হয়। যে পক্ষে মত বেশি আসে সে পক্ষের রায়ই চূড়ান্ত হয়। অর্থাৎ প্রস্তাবিত আইনটি পাশ হওয়ার ক্ষেত্রে ফিফটি ফিফটি চান্স থাকে। চাইলে হ্যাঁ-ও বলা যায়, অনুরূপ চাইলে না-ও বলা যায়। এটাকে আমরা সহজে বলতে পারি, প্রস্তাবিত আইনটি আদৌ কার্যকর করার উপযুক্ত নাকি উপযুক্ত নয়, তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সাংসদদের সামনে পেশ করা হয়। তারা এটাকে ভালো বা উপযাগী মনে করলে হ্যাঁ-ভোট দেয়, আর মন্দ বা অনুপযোগী মনে করলে না-ভোট দেয়। এরপর হিসাব করে দেখা হয়, কোন পক্ষে ভোট বেশি পড়েছে। যদি হ্যাঁ-ভোট বেশি পড়ে তাহলে আইনটি পাশ হয়ে যায়। আর যদি না-ভোট বেশি পড়ে তাহলে সেটাকে রিজেক্ট করে দেওয়া হয়।

এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কথা হলো, এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামপন্থী নির্বাচিত হয়ে সংসদে যাওয়া, সেটাই তো এক ধূসর মরীরিকা। এটা এমন এক তিক্ত বাস্তবতা, কোনো দলের অন্ধ সাপোর্টার না হলে এ ব্যাপারে দ্বিমত করার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে, কোনোভাবে ইসলামপন্থীরা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেল, কিন্তু সেক্ষেত্রে দুয়েকটি আইনে সামান্য পরিবর্তন করলেও মৌলিকভাবে কোনোকিছুই পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। নয়তো বৈশ্বিকভাবে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, যা মোকাবেলা করার মতো শক্তি বা সাহস কোনোটাই এসব গণতন্ত্রীদের নেই। সহজে বলা যায়, আমূল পরিবর্তন করার সুযোগ দেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে আমরা পরবর্তী পর্বগুলোতে বিশদ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এবার আসি তৃতীয় কথায়, কোনোভাবে ধরে নিলাম যে, ইসলামপন্থীরা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়ে সংসদে গেল এবং তাদের জন্য আইন পরিবর্তনের সকল সুযোগও তৈরি হলো, সেক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়? আমরা বলব, এটাই আমাদের আজকের আলোচনার মূল পয়েন্ট। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই চলুন বিষয়টি একটু ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বলি।

আপনি নিজের কল্পনার আয়নায় একটু চিন্তা করে দেখুন, সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামপন্থী সাংসদদের নিয়ে আপনি সংসদে প্রবেশ করলেন। আপনার আজকের উদ্দেশ্য চুরির জন্য হাত কাটার আইন পাশ করানো। প্রথমে নিয়মানুসারে এ আইনের ব্যাপারে সাংসদদের সামনে প্রস্তাব পেশ করা হলো। প্রস্তাব পেশ করার পর এটা আইন হিসেবে গৃহীত হওয়া ও না হওয়া নিয়ে ফিফটি ফিফটি চান্স সৃষ্টি হলো। অর্থাৎ এখন নিউট্রাল অবস্থায় আছে। সংবিধান অনুযায়ী এটা আইন হিসেবে গৃহীত হলেও ঠিক আছে, আবার কোনোভাবে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট না পড়ে তাহলে আইন না হলেও ঠিক আছে। সাংবিধানিক আইন এটাই বলে। এখন আপনি একজন মুসলিম হিসেবে গভীরভাবে চিন্তা করে বলুন তো, এটা কি আল্লাহর আইনের সুস্পষ্ট অবমাননা নয়? এটা কি আল্লাহর আইন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নয়?? এটা কি আল্লাহর আইনের চেয়ে মানুষের রায়কে অগ্রাধিকার দেওয়া নয়??? আল্লাহ হলেন পুরো জাহানের সৃষ্টিকর্তা। আর আমরা হলাম তাঁর আজ্ঞাবহ নগন্য দাস। সেই দাস হয়ে যদি আমরা মহান মনিবের হুকুমকে নির্দ্বিধায় না মেনে নিয়ে পর্যালোচনায় বসি যে, এটা মানা হবে নাকি প্রত্যাখ্যান করা হবে, তাহলে এর চেয়ে বড় আল্লাহদ্রোহ আর কী হতে পারে? অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا.

'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের ভিন্ন (আরেকটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার) কোনো অধিকার নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হবে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে।' [সুরা আল-আহজাব : ৩৬]

একবার না বুঝলে উপরিউক্ত কথা এবং আয়াতটি কয়েকবার পড়ুন। চিন্তা করে দেখুন, কী ভয়ানক ব্যাপার! আমাদের এ অধিকার কে দিলো যে, আমরা আল্লাহর ফয়সালাকৃত বিধান নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনা করে দেখব যে, তা বাস্তবায়িত করা হবে নাকি হবে না? আল্লাহর বিধানকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে না নিয়ে মানুষের মতামত নিয়ে তা যাচাই করতে যাওয়াটাই তো মারাত্মক পর্যায়ের কুফর। আপনার এ দুঃসাহস হলো কী করে যে, আপনি আল্লাহর বিধান নিয়ে মন্তব্য করবেন? তাঁর বিধান কার্যকর হবে কিনা, সেটার জন্য মানুষদের রায় নিতে হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত নিতে হবে, এ অনুমতি আপনাকে কে দিয়েছে? এটা কি সুস্পষ্ট আল্লাহদ্রোহ নয়? এটা কি পরিষ্কার কুফর নয়? পর্যালোচনা তো কেবল সেটারই করা হয়, যেটায় ভুল বা সঠিক উভয়টি হওয়ার

সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহর বিধান ও তাঁর ফয়সালাকৃত আইনে কি ভুল হওয়ার সামান্যতম চান্সও আছে? ভুল হওয়ার সামান্য সন্দেহ করলেই তো ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে যে সিস্টেম আল্লাহর আইনকে পর্যালোচনার স্থানে নিয়ে যায়, সেটা কখনো ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হতে পারে না; বরং এটা হলো পরিষ্কার কুফরি সিস্টেম।

বস্তুত আল্লাহর ফয়সালাকৃত আইন যখন সংসদে পর্যালোচনার জন্য পেশ করা হলো, তখনই প্রমাণ হয়ে গেল যে, আল্লাহর ফয়সালাকৃত আইন বা তাঁর সিদ্ধান্তে আমরা সন্তুষ্ট নই; বরং এতে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি। আল্লাহর আইনই চূড়ান্ত নয়; বরং আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যেটা পাশ করাব, সেটাই আইন। আল্লাহর আইন আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদের মতের অনুকূলে হলেই কেবল আইন হবে, অন্যথায় সেটা কোনোদিনও আইনের মর্যাদা পাবে না। মোটকথা অধিকাংশের মতামত পাওয়ার আগ পর্যন্ত সেটা আইন নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের সাংসদের অনুমোদন পাওয়ার পরই সেটা আইন হচ্ছে। তাহলে এটাকে আল্লাহর আইন বলা হয় কীভাবে? এটা তো মানবরচিত আইনের অন্তর্গত। আল্লাহর আইন তো তখনই হবে, যখন তা বিনা বাক্যব্যয়ে আইন হিসেবে মেনে নেওয়া হবে; চাই কেউ এর পক্ষে থাকুক কিংবা না থাকুক। কিন্তু ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত নিয়ে যে আইন পাশ করা হবে, সেটা তো মানুষের মতের অনুগামী আইন হবে, সেটাকে প্রকৃতার্থে আল্লাহর আইন বলার সুযোগ নেই। আর কাফিররা তো এটাই চায় যে, মানুষের মতই চূড়ান্ত থাকুক, আল্লাহর আইন নয়।

এখন একটু চিন্তা করে বলুন তো, এটাকে কি কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মুসলিম ইসলাম প্রতিষ্ঠা বলার দুঃসাহস দেখাবে? এটা তো ইসলামের চূড়ান্ত অমর্যাদা! এটা তো আল্লাহর আইনের চরম অসম্মান!! আল্লাহর স্পষ্ট আইনকে মানুষের সামনে পর্যালোচনার জন্য পেশ করা তো পরিষ্কার কুফর। অথচ এ কুফরকেই আপনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা বলে প্রচার করছেন! আপনি যদি মনে করেন, গণতান্ত্রিক সিস্টেমে একবার সরকার হতে পারলেই কেল্লা ফতেহ; আপনি যদি ভেবে থাকেন ক্ষমতায় গিয়ে সংবিধান পাল্টে ফেলবেন, সব কুফরি সিস্টেম পরিবর্তন করে ফেলবেন, তাহলে এখনও আপনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন! সামরিক শক্তি ও ভূ-রাজনৈতিক পরিপক্কতা অর্জন ছাড়া এ সিস্টেমের বিপরীতে গিয়ে আপনি একদিনও টিকতে পারবেন না। এটা কেন সম্ভব নয়, সে ব্যাপারে যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণাদি আমরা সামনের পর্বগুলোতে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং আপনি যখন গণতান্ত্রিক সিস্টেম ঠিক রেখে সংসদ চালাবেন, তখন তো প্রতিনিয়ত আপনি কুফরকে প্রমোট করবেন এবং আল্লাহর আইনের অবমাননা করে চলবেন। এভাবে দীর্ঘমেয়াদে আল্লাহর আইনকে অবজ্ঞা করার অনুমতি কি আপনাকে ইসলাম দেয়? এটা কোন জরুরত আর কোন ইকরাহ (বাধ্যবাধকতা), যার ভিত্তিতে আপনাকে এমনটা করার অনুমতি দেওয়া হবে? আর যদি সিস্টেম পাল্টাতে চান, কুফরি সিস্টেমকে পরিবর্তন করে পুরোপুরি ইসলামি নিয়ম জারি করতে যান, তাহলে গণতন্ত্রের প্রভুরা তো আপনাকে সিস্টেম পাল্টাতে দেবে না। সেক্ষেত্রে আপনার সামনে দুটি পথ খোলা থাকবে। হয় তাদের কথা মেনে নিয়ে আগের নিয়মেই সবকিছু চালাবেন, নয়তো তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। ব্যাপারগুলো কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি, নাকি ক্ষমতায় যেতে হবে, সে চিন্তায় বিভোর হয়ে শরিয়তের সকল নীতি-উসুল লঙ্ঘন করার প্রস্তুতি নিচ্ছি?

হে প্রিয় ভাই আমার, এ ব্যাপারে একটু চিন্তা করুন। দলের প্রেমে অন্ধ না হয়ে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবুন। আদৌ কি এটা ইসলাম প্রতিষ্ঠা নাকি ইসলাম অবমাননার পথ? সাধারণ মানুষের আবেগ ও ইসলামের প্রতি ভালোবাসাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে ইসলামের অপমান বন্ধ করুন। আল্লাহর আইনকে অবজ্ঞা করার পথ থেকে ফিরে এসে নববি মানহাজে চলুন। বাংলাদেশের সব মানুষ যদি আজ নামাজের পক্ষে চলে যায়, আর এ চাওয়ার ভিত্তিতেই সংসদে নামাজের আইন পাশ করা হয়, তবুও এটাকে কুফরেরই বিজয় বলতে হবে, ইসলামের বিজয় বলার ন্যূনতম কোনো সুযোগ নেই। কেননা, এখানে আল্লাহর আইন ও তাঁর বিধান হিসেবে নয়; বরং অধিকাংশ মানুষের চাওয়ার ভিত্তিতে আইন পাশ হয়েছে। তাই আপনাকে বলছি, হে আমার দ্বীনের ভাই, ইসলামপ্রিয় সাধারণ মানুষকে আর বোকা বানাবেন না। তাদেরকে সত্যিটা জানান, জানার সুযোগ করে দিন। এমন কুফরি সিস্টেমের ইসলামকে বাইড্রেনরা পছন্দ করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনোদিন এটাকে পছন্দ করবেন না।

গণতন্ত্রের নানা অসংগতি ও সমস্যার কথা অনেকেই আলোচনা করেন, কিন্তু খুব কম মানুষই এ মারাত্মক বিষয়টি তুলে ধরেন। বিষয়টি যদি ব্যাপকভাবে আলোচিত হতো, সবার কানে কানে যদি কথাগুলো পৌঁছে যেত তাহলে আমাদের ধারণা অধিকাংশ মুসলিম এ কুফরি মতবাদ ত্যাগ করে সে পথে প্রত্যাবর্তন করার চিন্তা করত, যে পথে চলেছেন রাসুল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়িন ও তৎপরবর্তী প্রত্যেক যুগের হকপন্থী জামাত। আজকের পর্বের মূল কথাগুলো যদি কোনো মুসলিম নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হৃদয়ের জানালা খুলে দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে তাহলে তাকে আর পরবর্তী সময়ে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তাকে গণতন্ত্রের অসারতা আর নির্বাচনের মতো কুফরি ব্যবস্থার ব্যাখ্যা নতুন করে বুঝানো লাগবে না। আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখা দরকার যে, নববি পথ ও পন্থা পরিত্যাগ করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও কেউ সফল হয়নি, আর না ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ বাস্তব সত্য আমরা যত আগে বুঝতে পারব ততই আমাদের জন্য কল্যাণ।

শেষ করছি উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেই বিখ্যাত উক্তি দিয়ে, যার বাস্তবতা আজ পুরো মুসলিম উম্মাহ হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে, যার সত্যতা আজ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হতে দেখা যাচ্ছে। কথাটি খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত। কোনো এক ঘটনা প্রসঙ্গে উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু রাগান্বিত হয়ে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন :

إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ.

‘(মনে রেখো, ইসলামপূর্ব সময়ে) আমরা ছিলাম সবচেয়ে লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত এক জাতি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। অতএব যখনই আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মান তালাশ করব তখনই আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।’ [মুসতাদরাকুল হাকিম : ১/১৩০, হাদিস নং ২০৭, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত]

কেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়?

কিছু মানুষের ধারণা ইসলামি রাষ্ট্র গঠনই যেহেতু মূল লক্ষ্য, বিধায় যে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হোক না কেন, তা শরিয়া অনুমোদিত ও বৈধ হয়ে যাবে। তাদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে সিরাত থেকে দলিলও দিয়ে থাকে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধে মদিনায় প্রবেশপথে যে পরিখা খনন করিয়েছিলেন, সেটা ছিল পারস্যের অগ্নিপূজারিদের কৌশল, যা তিনি সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে জানতে পারেন। অতঃপর কৌশলটি পছন্দ হওয়ায় তিনি তার প্রায়োগিক ব্যবহার করে উপকৃতও হলেন। এ ঘটনা উল্লেখ করে তাদের একদল বলতে চায়, কাফিরদের আবিষ্কৃত যেকোনো কলা-কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। এটার ভিত্তিতেই তারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বেছে নিয়েছে গণতন্ত্র নামক কুফরি তন্ত্রের মতো ইমানবিধ্বংসী এক পথ, যে পথে ব্যর্থতা ছাড়া সফলতার কোনো নজির নেই।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, সিরাতের উপরিউক্ত ঘটনা থেকে কী বুঝার ছিল, আর তারা বুঝলটা কী! এখান থেকে কি এটা প্রমাণিত হয় যে, কাফিরদের প্রণীত যেকোনো কৌশল, তাদের আবিষ্কৃত যেকোনো প্রযুক্তি মুসলিমরা গ্রহণ করতে পারবে? নাকি কাফিরদের কৌশল ও প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতিমালা আছে? এ ব্যাপারে আলিমদের কোনো মতানৈক্য নেই যে, কাফিরদের কৌশল ও প্রযুক্তি মুসলিমদের জন্য ততক্ষণই ব্যবহারের অনুমতি আছে, যতক্ষণ তাতে কুফর, শিরক, হারাম বা মাকরুহ জাতীয় কোনো বিষয় না থাকবে। খন্দকের যুদ্ধে ঠিক এটাই ঘটেছে। কেননা, যুদ্ধের জন্য পরিখা খনন না কুফর, না শিরক, না হারাম আর না মাকরুহ। সুতরাং যুদ্ধের ক্ষেত্রে কাফিরদের আবিষ্কৃত একটি বৈধ যুদ্ধকৌশল অবলম্বনের ঘটনা থেকে এটা কীভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাদের আবিষ্কৃত কুফরি পদ্ধতিও মুসলিমদের জন্য অনুমোদিত?

মূলত শত্রুদের দেখানো পথে যে কখনো গন্তব্যে পৌঁছা যায় না, এ সহজ নীতিটিও আজ অনেকে বুঝতে চায় না। এমন সরল ও স্বীকৃত একটি বিষয়ও যাদের বুঝে আসে না, তারা কীভাবে ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনা করার সাহস দেখায়? একসময় এ ব্যাপারে কিছু মানুষ সাপোর্ট করলেও বর্তমানে এর বাস্তবতা ও কদর্যতা বুঝতে অনেকেই এ পথ পরিত্যাগ করছেন। শত্রুদের দেখানো এ পন্থায় শারয়ি সমর্থন না থাকার পাশাপাশি এতে যে শেষ পর্যন্ত সফলতা আর মুক্তি নেই, তা আজ বিবেকবানদের কাছে

দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। আজকের আলোচনায় আমরা এ দিকটি স্পষ্ট করব যে, কেন গণতন্ত্র দিয়ে কখনোই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আশা করি, মনোযোগ সহকারে পুরো লেখাটি পড়লে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমরা এখানে পনেরোটি কারণ উল্লেখ করছি, যা প্রমাণ করবে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

প্রথম কারণ : কুফর-শিরক মিটিয়ে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার পর ইসলামি রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, রাষ্ট্রীয়ভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। এ কাজ না করলে সহিহ হাদিসে শাসকের বিরুদ্ধে (শর্তসাপেক্ষে, যার বিশদ বিবরণ রয়েছে ফিকহের কিতাবাদিতে) অস্ত্রধারণ করার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। ন্যায়পরায়ণ ও নেককার শাসকদের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে, তার বিবরণ উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

‘তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি জমিনের বুকে (ক্ষমতায়) প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর সব কাজের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহরই ইখতিয়ারে।’ [সুরা আল-হজ : ৪১]

সহিহ মুসলিমে আউফ বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ.

‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে; তারা তোমাদের জন্য দুআ করে, তোমরাও তাদের জন্য দুআ করো। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে; তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি তাদেরকে তরবারি দ্বারা প্রতিহত করব না? তখন তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নয়।’ [সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৮১, হাদিস নং ১৮৫৫, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত]

নামাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্তব্য কী, এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এর মত হলো, বে-নামাজিকে জেলে বন্দি করে রাখা হবে; যতক্ষণ না সে তাওবা করে নামাজ শুরু করার প্রতিজ্ঞা করে। আর অন্য ফকিহদের মত হলো তাকে প্রথমে তাওবার আহবান জানানো হবে। তাতে সাড়া না দিলে তাকে হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে ‘আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা’-তে এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতামত উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ جَاحِدًا لَهَا يَكُونُ مُرْتَدًّا، وَكَذَا الزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. وَأَمَّا تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً فَفِي حُكْمِهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: يُقْتَل رِدَّةً، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْل سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَأَبِي عَمْرٍو، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَحَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ نَفْسِهِ، وَحَكَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَالْقَوْل الثَّانِي: يُقْتَل حَدًّا لاَ كُفْرًا، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَالْقَوْل الثَّالِثُ: أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ كَسَلاً يَكُونُ فَاسِقًا وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

‘এতে কারও মতানৈক্য নেই যে, যে-ব্যক্তি নামাজ অস্বীকার করে পরিত্যাগ করবে সে মুরতাদ (ইসলামত্যাগী) হয়ে যাবে। অনুরূপ জাকাত, রোজা ও হজেরও একই বিধান। কেননা, এগুলো সর্বসম্মতভাবে ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ ও জ্ঞাত আবশ্যকীয় বিধান। তবে অলসতাবশত নামাজ পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়। প্রথম মত হলো, তাকে মুরতাদ হিসাবে হত্যা করা হবে।

এটা ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ এর একটি উক্তি। এছাড়াও সাইদ বিন জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবরাহিম নাখয়ি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আবু আমর রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আওজায়ি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আইয়ুব সাখতিয়ানি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইসহাক বিন রাহুয়াহ রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আব্দুল মালিক বিন হাবিব মালিকি রাহিমাহুল্লাহ; এদের মতও এরূপই। শাফিয়ি মাজহাবের দুটি মত হতে একটি মত এমনই। ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ থেকে এ মতটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু হাজাম রাহিমাহুল্লাহ এ মতটি উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু, মুআজ বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুর রহমান বিন আঊফ রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ প্রমূখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় মত হলো, তাকে হত্যা করা হবে হদ (শারয়ি দণ্ড) হিসেবে, মুরতাদ হিসেবে নয়। এটা ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ এর মাজহাব। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ এর একটি উক্তিও এমনই। তৃতীয় মত হলো, যে ব্যক্তি অলসতাবশত নামাজ পরিত্যাগ করবে সে ফাসিক বলে বিবেচিত হবে। নামাজ পড়ার আগ পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হবে। আর এটাই হানাফিদের মাজহাব।' [আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা : ২২/১৮৭, প্রকাশনী : অজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যা, কুয়েত]

এখন ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ গণতন্ত্র কতটুকু সফল হবে? ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের মাত্র ২% মানুষ নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। তাহলে আপনি কি করে আশা করেন যে, তারা নামাজ প্রতিষ্ঠার এ ধরনের বিধানের পক্ষে ভোট দেবে, আর তাদের ভোটে ইসলামি বিধান বাস্তবায়িত হবে! বে-নামাজি মানুষদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে তাদের জন্য নামাজকে বাধ্যতামূলক করা আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। বস্তুত গণতন্ত্রবাদী কোনো ইসলামি দল যদি ভাগ্যক্রমে ক্ষমতায় চলেও আসে তবুও তারা কখনোই ইসলামি বিধানানুসারে নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কেননা, গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুসারে তারা এটার জন্য কাউকে বাধ্যও করতে পারবে না। বাধ্য করতে গেলে সেখানে জাতিসংঘ-সহ পশ্চিমাবিশ্ব সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে। এমনকি প্রয়োজন হলে তারা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তাদের মসনদও উল্টে দিতে পারে; যেমনটি মিশরে হয়েছিল। এক্ষেত্রে তারা বলতে পারে, আমরা আইন না করলেও দাওয়াতের মাধ্যমে সকল মানুষকে নামাজমুখী বানাব। সেক্ষেত্রে আমাদের কথা হলো, আইন করা ছাড়া দাওয়াতের মাধ্যমে সবাইকে নামাজি বানানো হলেও সেটা ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না।

বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কারভাবে খুলে বলি। গণতন্ত্রবাদী কোনো ইসলামি দল ক্ষমতায় এসে যদি ব্যাপক দাওয়াতি কার্যক্রম ও ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে যদি রাষ্ট্রের শতভাগ মুসলিমকেও নামাজি বানিয়ে ফেলে তবুও আমরা কখনো ওই রাষ্ট্রকে ইসলামি রাষ্ট্র বলতে পারব না; যতক্ষণ না সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে বে-নামাজির জন্য সুনির্ধারিত শাস্তির বিধান থাকে; চাই সেটা ফিকহে হানাফির মতানুসারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রেখে হোক কিংবা অন্যান্য মাজহাব অনুসারে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে হোক। কিন্তু যে রাষ্ট্রে বে-নামাজির জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান আছে, সে রাষ্ট্রের সকল মানুষ যদি নামাজ নাও পড়ে তবুও সেটাকে ইসলামি রাষ্ট্র বলা হবে। বস্তুত ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণেই এই বিভ্রান্তিগুলো ছড়ানো হচ্ছে। কেউ কেউ তো এমনটিও মনে করে যে, তাদের দল পার্লামেন্টের ১৫১টি আসন পেলেই বুঝি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে!! এটা যে কতবড় মারাত্মক বিভ্রান্তি, তা আমরা ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় কারণ : ইসলাম নামক মুক্তির বিহঙ্গ আজ জাতীয়তাবাদ নামক লোহার খাঁচায় বন্দী। মুসলিমদের সীসাঢালা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আজ আমেরিকা, ব্রিটেনের এঁকে দেওয়া সীমারেখায় কেঁদে কেঁদে মরছে। গণতন্ত্র কি পারবে এ লোহার খাঁচা ভেঙে উম্মাহকে পুনরায় ঐক্য আর মুক্তির স্বাদ দিতে? শত্রুর পাতা ফাঁদে পা দিয়ে, তাদেরই শেখানো বুলি আওড়িয়ে শত্রু বধের কৌশলের কথা শুনলে তো পাগলেও হাসবে। যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে খিলাফত ধ্বংস করা হয়েছে, সে গণতন্ত্র দিয়েই খিলাফত ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা কতটা যে বোকামি, তা একসময় মানুষ না বুঝলেও বর্তমানের সচেতন যেকোনো মুসলিমই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছে। আর তাই তো শত্রুর পাতা এ ফাঁদ থেকে আজ অনেকেই মুক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করছে সেই পথ অভিমুখে, যে পথে চলেছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রতিটি যুগের হকপন্থী জামাত।

তৃতীয় কারণ : কোনো ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম থেকে ইহুদি বা খ্রিস্টান হয়ে গেলে কিংবা নাস্তিক হয়ে গেলে ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, তাকে তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসার আহবান জানানো। এতে সে অসম্মতি প্রকাশ করলে রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো, তাকে হত্যা করা। যেমন সহিহ বুখারিতে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

'যে-ব্যক্তি নিজের দ্বীন (অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম) পরিবর্তন করে ফেলবে, তোমরা তাকে হত্যা করো।' [সহিহুল বুখারি : ৪/৬১, হাদিস নং ৩০১৭, প্রকাশনী : দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত]

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় সুনানে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা শেষে লিখেছেন :

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي الْمُرْتَدِّ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: تُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: تُحْبَسُ وَلاَ تُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ.

'মুরতাদের শাস্তির বিষয়ে আহলে ইলমের নিকট এটাই অনুসৃত বিধান। তবে কোনো নারী ইসলাম ত্যাগ করলে তার বিধানের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম মতানৈক্য করেছেন। একদল উলামায়ে কিরামের মতে (পুরুষ মুরতাদের মতো) তাকেও হত্যা করা হবে। এটা ইমাম আওজায়ি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ এর মত। আর অন্য আরেক দল উলামায়ে কিরাম বলেন, তাকে বন্দি করে রাখা হবে, হত্যা করা যাবে না। এটা ইমাম সুফইয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্য কুফাবাসী ফুকাহায়ে কিরামের মত।' [সুনানুত তিরমিজি : ৩/১১১, হাদিস নং ১৪৫৮ সংশ্লিষ্ট আলোচনা, প্রকাশনী : দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত]

আপনার কি মনে হয়, যারা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচ ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য ওয়ার অন টেরর নামে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ পরিচালনা করছে, পাশাপাশি মানুষকে ইসলামবিমুখ, নাস্তিক ও মুরতাদ বানানোর জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে, তারা এত সহজেই আপনাকে এই আইন বাস্তবায়ন করতে দেবে? বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যথাযথ সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা অর্জন করা ছাড়া স্রেফ নির্বাচনে জয়ী হয়ে এসব আইন করার কল্পনাও করা যায় না। আর পুরো দুনিয়ার গণতন্ত্রীদের এসব বিষয়ে সক্ষমতার স্তর যে কত নিম্নমুখী, সেটা আমাদের বলার প্রয়োজন নই, সেটা তারা নিজেরাই স্বীকার করে।

চতুর্থ কারণ : ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে জিজিয়া-কর আদায় করা। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন :

قَالَ الْمُخَصِّصُونَ بِالْجِزْيَةِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ: الْمُرَادُ مِنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ إِعْدَامُ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ مِنَ الْأَرْضِ وَأَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [البقرة: 193] ، وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39] ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَلَّا يُقَرَّ كَافِرٌ عَلَى كُفْرِهِ، وَلَكِنْ جَاءَ النَّصُّ بِإِقْرَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، فَاقْتَصَرْنَا بِهَا عَلَيْهِمْ وَأَخَذْنَا فِي عُمُومِ الْكُفَّارِ بِالنُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى قِتَالِهِمْ إِلَى أَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.

'জিজিয়া শুধু ইহুদি-খ্রিষ্টানদের জন্যই প্রযোজ্যকারী ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, নবি-রাসুলদের প্রেরণ ও কিতাবসমূহ অবতরণের উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবী থেকে কুফর-শিরক একেবারে নিশ্চিহ্ন করা এবং একমাত্র আল্লাহর দ্বীনই পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।' (সুরা আল-বাকারা : ১৯৩) অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এবং যতক্ষণ না দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।' (সুরা আল-আনফাল : ৩৯) এ আয়াতের দাবি হলো, কোনো কাফিরকেই তার কুফরের উপর থাকতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু অন্য আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানরা অবনত মস্তকে বশ্যতা স্বীকার করে জিজিয়া দিলে সেক্ষেত্রে তাদেরকে অব্যহতি দেওয়ার কথা এসেছে। অতএব, আমরা শুধু তাদের ব্যাপারেই ক্ষান্ত থাকব। আর অন্য কাফিরদের ব্যাপারে

ওই আয়াত গ্রহণ করব, যেখানে সামগ্রিকভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে।' [আহকামু আহলিজ জিম্মাহ : ১/৯৫, প্রকাশনী : রামাদি, দাম্মাম]

অতএব, যারা ঠুনকো কারণে-অকারণে মার্কিন, চীন বা ভারতীয় দূতাবাসে ধরনা দেয়, যারা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রণীত পদ্ধতিতে এবং তাদেরই সাপোর্টে ক্ষমতায় আসতে চায়, তারা ইহুদি-খ্রিষ্টান নাগরিকদের ওপর ইসলামি জিজিয়া-কর ব্যবস্থা চালু করার সাহস দেখাবে বলে আপনার মনে হয়? কুফফারদের ফর্মুলা অনুসরণ করে, তাদের সাহায্য গ্রহণ করে উল্টো তাদের স্বার্থবিরোধী আইনের স্বপ্ন দেখা কি নিছক বিভ্রান্তি নয়? এটা তো একমাত্র তখনই সম্ভব, যখন আপনি তাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাদের মুখে মুখ রেখে কথা বলার মতো প্রয়োজনীয় সাহস ও যথাযথ উপকরণ তৈরি করবেন। এর আগে এসব চিন্তা করা বাতুলতা বৈ কিছু নয়।

পঞ্চম কারণ : ইসলামি রাষ্ট্র বানাতে হলে অবশ্যই তাকে ইসলামবিরোধী সকল প্রকার বাতিল মতবাদ, মানবরচিত কুফরি তন্ত্রমন্ত্র ও এসংশ্লিষ্ট দলসমূহকে নিষিদ্ধ করতে হবে। চাই তারা বামপন্থী হোক, সেক্যুলার হোক, কিংবা জাতীয়তাবাদী হোক। তাদেরকে তাওবা করার আহবান জানানো হবে। তাওবা করলে তারা মুক্ত ও ক্ষমাযোগ্য; অন্যথায় তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করে হত্যা করা হবে। শুধু এতটুকুই নয়; বরং ইসলামি আইন অনুসারে 'সরকারি দল' এবং 'বিরোধী দল' এসব পরিভাষা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করতে হবে। কেননা, ইসলামে সকল প্রকার দলাদলি নিষিদ্ধ। এক আমিরের নেতৃত্বে গোটা উম্মাহ পরিচালিত হবে। এটাই হলো ইসলামি শাসনব্যবস্থার রূপরেখা। বহুদলীয় গণতন্ত্র স্বীকার করে নিয়ে এ কাজ করার সুযোগ কোথায়?

জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় এসে তাদেরই প্রিয় নাস্তিক বুদ্ধিজীবী ও ইসলামবিরোধী কবি-সাহিত্যিককে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে হত্যা করার নৈতিক শক্তি গণতান্ত্রিক ইসলামি দল কোথায় পাবে? প্রচলিত সিস্টেমে ক্ষমতায় এসে এসব বাস্তবায়ন করা আদৌ সম্ভব? রাজনৈতিক দলসমূহকে নিষিদ্ধ করতে গেলে কার্যত গণতন্ত্রকেই কবর চাপা দিতে হবে। যে জনগণের কাছ থেকে ভোটভিক্ষার মাধ্যমে দলটি ক্ষমতায় এসেছে, তারা এটা মানবে কেন? ওই সমস্ত দল বা তাদের সাপোর্টাররাই বা বসে থাকবে কেন? আর পশ্চিমারাই বা বসে বসে আঙুল চুষবে কেন? তাই হয় ইসলাম প্রতিষ্ঠার চিন্তা বাদ দিতে হবে, নয়তো নিজেদের ক্ষমতার মসনদ ছাড়তে হবে। ঘুরেফিরে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই আদি ও আসল পদ্ধতিতেই ফিরে যেতে হবে, যেটায় রয়েছে আল্লাহর নুসরাত ও যেখানে রয়েছে বিজয় ও সাফল্যের শত-সহস্র ইতিহাস।

ষষ্ঠ কারণ : একটি ইসলামি রাষ্ট্র সকল প্রকার অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, যত্রতত্র বেপর্দা চলাফেরা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সহশিক্ষা, অশ্লীল নাটক, সিনেমা, যাত্রাপালা নিষিদ্ধ করবে। সিনেমা হল, নাইটক্লাব, মদের বার, ডিজে পার্টি, নিষিদ্ধ গানের আসর বন্ধ করবে। সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলবে। ইসলামি মূল্যবোধ বিরোধী পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ব্লগ, সাময়িকী, বইপত্র, কবিতা, উপন্যাস, সাহিত্য নিষিদ্ধ করবে। বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম (প্রস্তরাঘাত করে হত্যা) করবে। সমকামীদের দৃষ্টান্তমূলক চরম শাস্তি বা প্রয়োজনবোধে হত্যা করবে। চারুকলা-কারুকলার নামে নিষিদ্ধ মূর্তি-ভাস্কর্য তৈরির চর্চা বন্ধ করবে। গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত সরকারের এসব করার সুযোগ কোথায়?

আপনি যদি ক্ষমতায় যেতে চান তাহলে আপনাকে জনপ্রিয়তা খুঁজতে হবে। বিদেশি প্রভুদের সাহায্য ও তাদের আশির্বাদ নিতে হবে। আর আপনি যদি জনপ্রিয়তা খুঁজতে চান এবং পশ্চিমাদের সাহায্য তালাশ করেন তাহলে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, উল্টো আপনার নিজের মাঝেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম থাকবে না। আসলে জনপ্রিয়তার রাজনীতিই আজকের ইসলামি দলসমূহের আদর্শিক অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন :

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.

‘আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা অনুসারে চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। তারা তো কেবল ধারণারই অনুসরণ করে থাকে, আর তারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথাই বলে।’ [সুরা আল-আনআম : ১১৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ- وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.

‘যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও (ইসলামের চূড়ান্ত) বিজয়, আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।’ [সুরা আন-নাসর : ১-২]

কাজেই ইসলামের বিজয় আসলে মানুষ এমনিতেই দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে। অধিকাংশ মানুষের সাপোর্ট আর তাদের সন্তুষ্টি অনুসরণের কোনোই প্রয়োজন নেই। কিন্তু গণতন্ত্রীরা উল্টো বুঝে মনে করে, আগে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে, তারপর সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তারা ইসলামের বিজয় ঘটাবেন। বস্তুত এটা কুরআনি নির্দেশনা ও বাস্তবতার পুরো বিপরীত। তাই আপনাকে আগে অন্যভাবে ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে। এরপর মানুষ অটোমেটিকভাবে দলে দলে ইসলামের বিবিধিবিধান মেনে নেবে।

সপ্তম কারণ : সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা উৎখাত করতে গেলে এবং জাকাত ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করতে গেলে দেশের ভোগবাদী ধনিশ্রেণি আপনাকে অপসারণ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। আর এটা আজ ওপেন সিক্রেট যে, তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া আপনি কখনো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জয়ী হতে পারবেন না। কেননা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে এই শিল্পপতী ও বুর্জোয়া শ্রেণির সমর্থনেই সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদেরকে এড়িয়ে কোনো কিছু করা অসম্ভবপ্রায়। আর এই শ্রেণির লোকেরা সুদের জোরেই জিইয়ে রেখেছে তাদের আদিগন্ত ভোগলিপ্সা, শাসন, শোষণ, অবৈধ কর্তৃত্ব আর সম্পদের বিশাল পাহাড়। আর এজন্য এরাই সবসময় পুঁজিবাদনির্ভর গণতন্ত্রের পেছনের কলকাঠি নাড়ে। প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগেও একটা গ্রুপ জাকাত দিতে অস্বীকার করে মুসলিম সেনদলের বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছিল। তাহলে তো বর্তমান যুগের পুঁজিবাদীদের কথা বলাই বাহুল্য।

অষ্টম কারণ : মিশর কিংবা আলজেরিয়ার মতো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য দরকার পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ। গণতন্ত্রীদের এসব পরিস্থিত সামাল দেওয়ার প্রস্তুতি কতটুকু? তাদের প্রস্তুতি তো কেবল পোস্টারিং আর দেয়াল লিখন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। বরং তারা এ ধরনের প্রস্তুতিকে অসাংবিধানিক ও অনিয়মতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে থাকে। অথচ আলিমদের পরিষ্কার মত হলো, সার্বক্ষণিক জিহাদের প্রস্তুতি মুসলিমদের জন্য ফরজ; চাই যুদ্ধের পরিস্থিতি থাকুক আর নাই থাকুক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ.

‘আর তোমরা তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো।’ [সুরা আল-আনফাল : ৬০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً.

‘কাফিররা কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের ওপর একযোগে ঝাপিয়ে পড়তে পারে।’ [সুরা আন-নিসা : ১০২]

সহীহ মুসলিমে উকবা বিন আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি :

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ، فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ.

'অচিরেই তোমাদের হাতে অনেক ভূখণ্ড বিজিত হবে এবং (শত্রুদের মোকাবেলায়) আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। এতদসত্ত্বেও তোমাদের কেউ যেন তীরন্দাজির প্রশিক্ষণ ছেড়ে না দেয়।' [সহিহু মুসলিম : ৩/১৫২২, হাদিস নং ১৯১৮, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত]

মূলত গণতন্ত্র হলো কাফিরদের তৈরি একটি ফাঁদ। যখন তারা দেখবে, একটি ইসলামি দল ক্ষমতায় চলে এসেছে তখন তারা মিথ্যা অভিযোগে তাদের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালাবে এবং তখনও তারা গণতন্ত্র রক্ষারই অজুহাত দেবে। দূর ও নিকট ইতিহাসে এর অনেক প্রমাণ আছে।

গনতন্ত্র নিয়ে আক্ষেপ করতে গিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ যথার্থই বলেছিলেন : 'গনতন্ত্র এমন একটা ধর্ম, যা তার অনুসারীদের বেঁধে দেয়। এমনকি বুলেটের আঘাতে তোমাদের বুক ঝাঁঝরা করে দিলেও তোমরা সর্বোচ্চ রাস্তায় গিয়ে একটু প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। আর এতটুকু করতে পারলেই তারা এই ভেবে পরিতৃপ্ত হয়ে যায় যে, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় হয়ে গিয়েছে!'

নবম কারণ : আমেরিকার র‍্যান্ড ইনস্টিটিউশন মডারেট মুসলিমদের যে চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে এবং যেগুলো তারা আমাদের ওপর আরোপ করতে চায় তার দুটি হলো :

ক. গণতন্ত্রকে (ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি মতে নয়; বরং) সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে যেভাবে পশ্চিমা ঐতিহ্যে বিশ্বাস করা হয়।

খ. ধর্মনিরপেক্ষ আইনের উৎস গ্রহণ করা। যারা বিশেষ কোনো ধর্মগ্রন্থের আইন চায় তারা মূলত চরমপন্থী।

বিস্তারিত জানার জন্য শাইখ আনওয়ার আল-আওলাকি রাহিমাহুল্লাহ এর Accepting Democracy as understood in the liberal western traditions লেকচারটি শুনতে পারেন।

আপনি হয়তো ভাবছেন, গণতন্ত্র গ্রহণ করলেই পশ্চিমারা আপনার ওপর খুশি হয়ে যাবে, আপনাদেরকে গুড মুসলিম বলে ঘোষণা করবে। কিন্তু ব্যাপারটি আদতে এমন নয়। তারা স্পষ্ট করেই বলেছে, সেই গণতন্ত্র নয়, যে গণতন্ত্র আপনি বুঝেন বা যে গণতন্ত্র আপনি পালন করতে চান; বরং তাদের বক্তব্য একেবারে সুস্পষ্ট যে, Accepting Democracy as understood in the liberal western traditions অর্থাৎ উদারপন্থী পশ্চিমা ঐতিহ্যে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করতে হবে।

তারা গনতন্ত্রবাদী ইসলামি দল 'ব্রাদারহুড' ইস্যুতে বলেছে :

as in the case of the present Egyptian Muslim Brotherhood is not Enough.

অর্থাৎ বর্তমান মিশরীয় মুসলিম ব্রাদারহুডের ক্ষেত্রে (গণতন্ত্রের এতটুকু চর্চা) যথেষ্ট নয়।

এর মানে দাঁড়াচ্ছে, পশ্চিমারা যে গণতন্ত্র চায়, আপনাকে সে গণতন্ত্রই চর্চা করতে হবে। এতে কোনো পরিমার্জন ও পরিবর্তন করলে তা তারা মেনে নেবে না।

প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য করুন, র‍্যান্ড ইন্স্টিটিউশনের সংজ্ঞায় যেটা মডারেট ইসলাম, আমাদের কাছে তা পরিষ্কার কুফর। এ বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদের অনেক আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন :

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.

'ইহুদি-খ্রিষ্টানরা কখনও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না; যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাত (অর্থাৎ ধর্মের আদর্শ) অনুসরণ করবেন।'
[সুরা আল-বাকারা : ১২০]

দশম কারণ : প্রতিপক্ষের ওপর বিজয়ী হবার সবচেয়ে সহজ কৌশল হলো, Divide & Rule অর্থাৎ বিভেদ সৃষ্টি করো এবং শাসনকার্য পরিচালনা করো। মোটাদাগে দেখলে এ দেশের অল্প কিছু মানুষই ইসলামপন্থী। অতঃপর বহুদলীয় গণতন্ত্রের ফর্মুলায় এই অল্প সংখ্যক ভোট ভাগ হবে এত এত বিচ্ছিন্ন ইসলামি দলগুলোর মাঝে। একদলের শাইখুল হাদিস দাঁড়াবে আর অপরদলের দাড়িবিহীন শিক্ষিত তরুণ হবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। অতঃপর সমর্থকদের মাঝে শুরু হবে নোংরা কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি, গিবত, অপবাদ আর পরনিন্দার বৃষ্টিধারা। দূর থেকে সেক্যুলার-বামপন্থীরা মজা লুটবে। আসলে গণতন্ত্র আর নির্বাচন এই উম্মাহর মাঝে বিভেদ ও অনৈক্যের বিষফোঁড়া রোপণ করে দিয়েছে, যার ফল আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি।

প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী হবার সবচেয়ে সহজ কৌশল হলো, Divide & Rule (জাতিকে বিভক্ত করে দাও, অতঃপর নির্বিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনা করো) মূলনীতির প্রয়োগ। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ দেশের অল্পকিছু মানুষই ইসলামি দলগুলোর সমর্থক। অতঃপর বহুদলীয় গণতন্ত্রের ফর্মুলায় এই অল্প সংখ্যক মানুষের ভোট আবার ভাগ হবে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত ইসলামি দলগুলোর মাঝে। আসলে গণতান্ত্রিক নির্বাচন এই উম্মাহর মাঝে বিভেদ ও অনৈক্যের বিষফোঁড়া রোপণ করে দিয়েছে, যার ফল আমরা আজ নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশে বর্তমানে ইসলামি রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ঠিক কতটি, তা এই মূহুর্তে বলা মুশকিল। তবে এর ভঙ্গুরতা এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, এদেশে কেবল ইসলামি ঐক্যজোটের সংখ্যাই চার থেকে পাঁচটি! তাহলে চিন্তা করে দেখুন, দল ও উপদলের সংখ্যা কতগুলো হতে পারে! এরা প্রত্যেকেই গণতন্ত্র ধ্বংস করে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার দাবি করে, আবার খিলাফাহ ধ্বংসকারী সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই পথ চলতে পছন্দ করে। এটা যে কতবড় স্ববিরোধিতা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

একাদশ কারণ : বর্তমানে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিদেশী প্রভাব একটি ওপেন সিক্রেট। প্রতিটি ইলেকশনের পূর্বে বিভিন্ন নেতা-নেত্রীদের গণতন্ত্রের প্রভুদের দেশে দৌড়াদৌড়ির দৃশ্য তাই খুবই কমন। বলা যায়, পশ্চিমা প্রভুদের পক্ষ থেকেই নির্ধারন করা হয়ে থাকে আগামী পাঁচ বছর কারা এদেশে তাদের প্রক্সি গোলাম হিসেবে কাজ করবে। তার ওপরে ভোটে কারচুপি, জাল ভোটপ্রদান, ব্যালট বক্স ছিনতাই, দুর্নীতি, নির্বাচন কমিশনের অবৈধ হস্তক্ষেপ, ক্ষমতার অপব্যবহার—এগুলো তো আছেই। এই সিরিয়ালে সর্বশেষ সংযোজন হলো, এক তরফা প্রহসনের নির্বাচন। ইসলামি দলগুলো তো দূরের কথা, সেক্যুলার দলগুলোরও এক্ষেত্রে আসলে কিছুই করার থাকে না।

আর গণতন্ত্রের তথাকথিত 'সর্বশক্তির উৎস' বলে পরিচত 'জনগন' তো এক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আর কিছুই করে না; এমনকি দুয়েকটি ফাঁকা বুলিও নয়। আসলে সাধারণ জনতার এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথাই নেই। 'চাচা তোর আপন প্রাণ বাঁচা' নিয়েই সবাই ব্যস্ত। দেশের মানুষ প্রহসনের নির্বাচনের আগেও যেমন সারাদিনের ক্লান্তি শেষে ঘুমোতে যেত, এখনও তেমনই যায়। দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দল বারবার ওয়াশিংটনের দিকে হাত তুলে মুনাজাত করেছিল, কিন্তু ওয়াশিংটন আকার ইঙ্গিতে ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছে, আমরা মুখে যাই বলি না কেন, কাজে আমরা তার পক্ষই গ্রহণ করব, যারা আমাদের বেশি সুবিধা দেবে আর নিষ্ঠাপূর্ণভাবে গোলামি করবে। সেক্যুলারদের প্রভুরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতিটি আপনি আরও ভালো করে বুঝবেন গণতন্ত্রের পুরোপুরি বিপরীত রাজতন্ত্রবাদী সৌদিদের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক থেকে। অর্ধ শতাব্দির বেশি সময় ধরে সৌদিআরবে রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব তো যুক্তরাষ্ট্রই পালন করছে। সেখানে তো তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে কোনো অরাজকতা সৃষ্টি করে না। সেখানে তো তারা জুলুম ও স্বৈরাচারির বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করে না। এর একমাত্র কারণ হলো, রাজতন্ত্র থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, উল্টো পেট্রোডলার চুক্তি করে সে অবিশ্বাস্যভাবে লাভবান হচ্ছে। আসলে তাদের দরকার কর্তৃত্ব আর আধিপত্য। তারা গণতন্ত্রের মন্ত্র তো জপে কেবল মুসলিম উম্মাহ ও তৃতীয় বিশ্বের লোকদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য।

পশ্চিমা বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো সাম্রাজ্যবাদ নীতি। বিভিন্ন মুসলিম দেশে আক্রমন করা, যুবকদের হত্যা করা, নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা, শিশুদের রক্ত ঝরানো, মূল্যবান খনিজ সম্পদ লুটে নেওয়া—এগুলো পশ্চিমাদের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। এজন্য তারা কখনোই কোনো দেশে এমন কোনো সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না, যারা তাদের দখলদারিত্বের বিরোধিতা করবে আর নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য জিহাদ পরিচালনা করবে। অথচ এ ব্যাপারে আলিমদের ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে যে, যখন কাফিররা কোনো মুসলিম দেশে আক্রমন করে তখন ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে সারা বিশ্বের মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়।

আমাদের এসব ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না :

ক. ইসলামের চিরশত্রু ইহুদি-খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একের পর এক ক্রুসেড যুদ্ধ চালিয়েছে, মুসলিমদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস দখল করে রেখেছে, ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা চালিয়ে স্পেন থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে দিয়েছে।

খ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া মিলে মুসলিমদের ঐক্য ও শক্তির কেন্দ্র তুরস্কের খিলাফাহব্যবস্থা ধ্বংস করেছে এবং মধ্যপ্রাচ্যকে ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড করেছে। কামাল আতার্তুর্ক নামক গাদ্দারের মাধ্যমে পশ্চিমারা সে সময় কার্যত তুরস্কে ইসলামকেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।

১৯২৪ সালের ২৪ জুলাই লুজান চুক্তি (Lausanne Treaty) স্বাক্ষর হওয়ার পর হাউস অফ কমন্সে তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্জন ঘোষণা দিয়েছিল যে, মূল বিষয় হচ্ছে তুরস্ক ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এটি আর কোনোদিনও মাথা তুলে দাঁড়াবে না। কারণ, আমরা তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ধ্বংস করে দিয়েছি। আর তা হলো খিলাফত এবং ইসলাম।' অনুরূপ বাইতুল মাকদিসে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার পর ব্রিটিশ জেনারেল অ্যালেনবি ঘোষণা করেছিল, 'আজ ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটল।'

আর দামেস্ক দখল করে নেওয়ার পর ফরাসি জেনারেল গরো ((Gourou) তড়িৎগতিতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি রাহিমাহুল্লাহ এর সমাধিস্থলে প্রবেশ করে তার কবরে লাথি মেরে বলেছিল, 'ওঠো সালাহউদ্দিন, আমরা আবার ফিরে এসেছি।' বস্তুত খিলাফত ধ্বংসের পর পশ্চিমাদের উল্লাসের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না।

গ. ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টার জন্য এবং আংশিকভাবে মুজাহিদদের সাহায্য করার জন্য এরাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছিল।

ঘ. এরাই সৌদি বাদশাহ ফয়সালকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করেছে। বাদশাহ ফয়সালের অপরাধ ছিলো, তিনি আমেরিকার মিত্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, মুসলিমদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন এবং পশ্চিমাদের কাছে তেল বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ঙ. মুসলিমদের পবিত্র ভূমিতে ১৯৪৮ সালে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হলে শহিদ হাসান আল বান্না যখন দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে ফিলিস্তিনকে ধ্বংস করা হচ্ছে, তখন তিনি দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে চাইলেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার তিন রাষ্ট্রদূত বৈঠক করে তাদের সিদ্ধান্তপত্র মিশরের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠায়। এর দুই মাস পর মিশরের রাজা ফারুকের সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান মাহমুদ আব্দুল মাজিদ শহরের সবচেয়ে বড় রাস্তায় শহিদ হাসান আল বান্নাকে হত্যার চেষ্টা করে। এতে তিনি আহত হন। এরপর তাকে সেখানে থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন রাজা ফারুকের আরেক ঘনিষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা মুহাম্মাদ ওয়াসফি পুনরায় হাসান আল বান্নাকে গুলি করে সেখানেই শহিদ করে দেয়।

দ্বাদশ কারণ : একথা কারও অজানা নয় যে, আধুনিক কালে নির্বাচন মানেই লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার ছড়াছড়ি। মিছিল, মিটিং, মাইকিং, পোস্টারিং ইত্যাদিতে কে কাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, সবসময় তারই প্রতিযোগিতা চলে। একগাদা ভাড়া করা

ক্যানভাসার যোগাড় করা হয়। কোথাও কোথাও তো অসভ্য নর্তকী আর গায়িকাদেরও ভাড়া করা হয়। এসব ক্যানভাসারদের কাজই হলো, জোর গলায় নিজের নেতার চরিত্রকে 'ফুলের মতো পবিত্র' বলে দাবি করা আর যে কোনোভাবে প্রতিপক্ষের নামে দুর্নাম ও কুৎসা রটনা করা। একগাদা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সুযোগ পেলে আকাশের চাঁদ হাতে এনে দেওয়ার গল্পও বাদ দেওয়া হয় না।

ভোটারদের মনোরঞ্জনের জন্য ক্ষণেক্ষণে পান, তামাক, চা, বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা, মদ, গাঁজা ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। এমনকি প্রয়োজনে নগদ টাকা-পয়সা দিয়েও ভোট কেনা হয়। যে এই কাজ যত বেশি করতে পারবে সে তত বেশি সফল। একজন ইসলামপন্থী না নিজের মিথ্যা গুণগান গাওয়ার জন্য লোক ভাড়া করতে পারে, না অন্যের নামে মিথ্যা বদনাম রটনা করতে পারে, না মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, না তরুণদের হাতে মদের বোতল আর বৃদ্ধদের হাতে হুক্কার ডিব্বা ধরিয়ে দিতে পারে, না সে দুর্নীতিবাজদের মতো ক্যানভাসে লাখ লাখ টাকা অপচয় করতে পারে, না সে কোটি কোটি টাকা দিয়ে ভোট কেনার মতো জঘন্য কাজ করতে পারে। এসব যদি সে না-ই পারে তাহলে এই গুনাহের প্রতিযোগিতায় তার কোনো স্থান নেই। কেননা, তথাকথিত নীতি-নৈতিকতার বুলি তো কত আগেই নগদ টাকা-পয়সা আর বিড়ি সিগারেটের গন্ধে কর্পুরের মতো উবে গেছে। আর যদি কোনো ইসলামি দল অন্যদের মতো নিজেরাও এসব করা শুরু করে তাহলে বুঝতে হবে তার মাঝে ইসলামি আদর্শ-চরিত্রের ছিঁটেফোঁটাও আর বাকি নেই। জনপ্রিয়তা অর্জনের স্রোতে গা ভাসিয়ে সব ধুয়েমুছে একেবারে সাফ হয়ে গেছে।

সহিহ বুখারিতে আবু মুসা আল-আশআরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: إِنَّا لاَ نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ.

'আমি ও আমার গোত্রের দু'ব্যক্তি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলাম। সে দু'জনের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে (কোনো বিষয়ে) আমীর নিযুক্ত করুন। দ্বিতীয়জনও অনুরূপ কথা বলল। তখন তিনি বললেন, আমরা এরূপ ব্যক্তিকে কোনো পদে মনোনীত করি না, যে তার প্রার্থী হয় এবং পদের প্রতি লালায়িত হয়।' [সহিহুল বুখারি : ৯/৬৪, হাদিস নং ৭১৪৯, প্রকাশনী : দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত]

ত্রিয়োদশ কারণ : গণতন্ত্রের মাধ্যমে একটা ইসলামি দল যদি কোনোভাবে ভাগ্যক্রমে ক্ষমতায় চলেও আসে তবুও তারা দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। দূর ও নিকট ইতিহাসের বাস্তবতা এটাই বলে। একবার যদি কোনোমতে পাঁচ বছরের মেয়াদ পার করতে পারেও, কিন্তু এর পরের ইলেকশনে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। সবচেয়ে ভালো শাসনেও জনগণের মাঝে 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস'—টাইপের অনুভূতি কাজ করতে পারে। ফলে আবারও দেশ পরিচালিত হবে কুফরি আদর্শ ও আগের মূলনীতিতে। এভাবে পাঁচ বছর ইসলাম আর পাঁচ বছর কুফর—এই অবস্থা তো আমাদের আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তৎকালীন কাফিরদের সেই প্রস্তাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, 'আপনি এক বছর আমাদের (বাতিল) ইলাহগুলোর ইবাদত করুর, আমরাও পরের বছর আপনার (সত্য) ইলাহের ইবাদত করব।' এরপর আল্লাহ তাআলা সুরা কাফিরুন অবতীর্ণ করে মুসলিম জাতিকে কী কঠিন বার্তা দিয়েছিলেন, তা কুরআনের পাঠক হিসেবে আমাদের সবারই জানা।

চতুর্দশ কারণ : অষ্টম কারণ বর্ণনায় সহিহ মুসলিমের একটি হাদিসের উদ্ধৃতিতে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিশ্রুতি জেনেছি যে, 'অচিরেই তোমাদের হাতে অনেক ভূখণ্ড বিজিত হবে এবং (শত্রুদের মোকাবেলায়) আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন।' এরপর তিনি মুসলিমদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, 'এতদসত্ত্বেও তোমাদের কেউ যেন তীরন্দাজির প্রশিক্ষণ ছেড়ে না দেয়।' এথেকে আমরা কী ইঙ্গিত পাই, তা বিবেকবানদের ব্যাখ্যা করে বুঝানোর প্রয়োজন নেই। যেখানে মুসলিমদের বিজয়ী হওয়ার সময়েও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের তীর-তলোয়ার রেখে দিয়ে উদাসীন হতে নিষেধ করেছেন, সেখানে মুসলিমদের পতনের কালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশনা ভুলে আমরা যদি কাফিরদের দেখানো আদর্শে পথ চলি, তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিজয়ী

হওয়ার পর আমরা যখন ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত করতে যাব তখন কি সামরিক সক্ষমতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছাড়া তা করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়? বস্তুত দিনশেষে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চিন্তা করলে কাফিরদের সাথে সংঘাত অনিবার্য। সেটা আগে বুঝে সে অনুসারে মুসলিমদের প্রস্তুতি নিতে না বলে যদি আমরা নিজেরাই তাদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে চলি তাহলে এটা কি মারাত্মক একটি ভুল নয়? বস্তুত কাফিরদের প্রণীত কথিত ভোট ও নির্বাচনের মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার মতো আমূল পরিবর্তন আসবে বলে বিশ্বাস করাটা সুস্পষ্ট বোকামি ও দুনিয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

পঞ্চদশ কারণ : দ্বীনকে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী করার জন্য প্রকৃত ইসলামি রাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী জিহাদ পরিচালনা করবে। কারণ, ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্য নয়; বরং সমগ্র পৃথিবীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। যদি মুসলিমরা অক্ষম না হয় এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধবিরতির কোনো চুক্তি না থাকে, তাহলে ইসলামি রাষ্ট্রকে পার্শ্ববর্তী কুফরি রাষ্ট্রে আক্রমন চালাতে হবে এবং তাদেরকে হয় ইসলাম, নয় জিজিয়া, নয় যুদ্ধের নীতিতে আহবান জানাতে হবে। এই জিহাদকে 'জিহাদুত তলব' বলা হয়। প্রত্যেক বছরে কমপক্ষে একবার এই ধরনের আক্রমন পরিচালনা করতে হবে। কখনো প্রয়োজন হলে একবারের বেশিও করা আবশ্যক হয়ে যায়।

ইমাম ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন :

وَأَقَلُّ مَا يُفْعَلُ مَرَّةً فِي كُلِّ عَامٍ؛ لِأَنَّ الْجِزْيَةَ تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي كُلِّ عَامٍ، وَهِيَ بَدَلٌ عَنْ النُّصْرَةِ، فَكَذَلِكَ مُبْدَلُهَا وَهُوَ الْجِهَادُ، فَيَجِبُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، إلَّا مِنْ عُذْرٍ... وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى الْقِتَالِ فِي عَامٍ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَجَبَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَوَجَبَ مِنْهُ مَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ.

'বছরে সর্বনিম্ন একবার জিহাদ করা আবশ্যক। কেননা, প্রত্যেক বছর জিম্মিদের ওপর একবার জিজিয়া আবশ্যক হয়। আর এটা হলো তাদেরকে নুসরাত বা সাহায্য-সহযোগিতার বিনিময়। অতএব, বিনিময়কৃত বস্তু তথা জিহাদও অনুরূপ হওয়া চাই। তাই প্রত্যেক বছর একবার জিহাদ ফরজ। তবে বিশেষ কোনো অপারগতা থাকলে ভিন্ন কথা। ...আর যদি এক বছরে একবারের বেশি জিহাদ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তাও আবশ্যক হয়ে পড়বে। কেননা, এটা ফরজে কিফায়া। সুতরাং প্রয়োজন হলেই তা আবশ্যক হয়ে যাবে।' [আল-মুগনি : ৯/১৯৮, প্রকাশনী : মাকতাবাতুল কাহিরা, মিশর]

ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ সুরা তাওবার ১২৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَقَالَ قَتَادَةُ (يُخْتَبَرُونَ) بِالْغَزْوِ فِي السَّنَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.

'কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বছরে একবার বা দুবার যুদ্ধের মাধ্যমে বিপদের সম্মুখীন করা হবে।' [তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/২১০, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত]

কাজেই ইসলামের দুশমন তাগুত ও তাদের দোসররা কখনোই নিছক কিছু টিপসই দিয়ে এরূপ রাষ্ট্র হতে দেবে না, যা তাদের অস্তিত্বকেই হুমকির সম্মুখীন করবে। এটা ততদিন পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতদিন না সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। তাই এসব বিজাতীয় পদ্ধতির অনুসরণ বাদ দিয়ে আমাদেরকে ফিরতে হবে সেই নববি পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতি অবলম্বন করে সাহাবায়ে কিরামের ক্ষুদ্রতম এক জামাত তৎকালীন পরাশক্তি রোম ও পারস্যের গর্ব ধুলোয় মিশিয়ে সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সারকথা : আশা করি, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কখনোই দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এদ্বারা না উম্মাহর ক্ষতের উপশম হবে, আর না হারিয়ে যাওয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। বস্তুত গণতন্ত্র হলো একটি ফাঁদ, একটি ধোঁকা ও একটি প্রতারণার জাল। এতসব বাস্তবতা জানার পরও, এতসব অভিজ্ঞতা অর্জন করার পরও কেন যে মানুষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি খুঁজতে চায়! একসময় কিছুটা অস্পষ্টতা থাকলেও আজ দিবালোকের ন্যায় সব স্পষ্ট হওয়ার পরও এই গণতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরে রাখার কোনোই যৌক্তিকতা নেই। যারা এখনও বিষয়টি বুঝছেন না বা বুঝার চেষ্টা করছেন না, তাদের জন্য আমরা কেবল একটি দুআই করি- 'হে আল্লাহ, আপনি সত্য উপলব্ধির জন্যে আমাদের অন্তরসমূহ উন্মুক্ত করে দিন, সঠিক বাস্তবতা বুঝার জন্য আমাদের বক্ষকে প্রসারিত করে দিন। সর্বশেষ একটি মনে রাখবেন, মুমিন একবার দংশিত

হওয়ার পর সাপের গর্তে দ্বিতীয়বার হাত দেয় না। যেমন সহিহ বুখারির বর্ণনায় ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لاَ يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

'মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার দংশিত হয় না।' [সহিহ বুখারি : ৮/৩১, হাদিস নং ৬১৩৩, প্রকাশনী : দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত]

যুগে যুগে গণতন্ত্রীদের পরিণতি ও শারিয়াহ প্রতিষ্ঠার উপায় : মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহের অনেক ইসলামি দল গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, এসব দল দ্বারা ইসলামের শাখাগত কিছু খেদমত ও উপকার হয়েছে। কোথাও কোথাও আংশিকভাবে সাময়িক সময়ের জন্য কিছু আইনগত পরিবর্তন আনার চেষ্টাও করা হয়েছে। কিন্তু মৌলিক ও চূড়ান্তভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা পরিপূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা এখানে বিশ্বের একাধিক দেশে ইসলামি রাজনীতি চর্চাকারী কয়েকটি বৃহৎ প্রাচীন ইসলামি দলের শুধু শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতার উপাখ্যান তুলে ধরব।

বিভিন্ন ইসলামি গণতন্ত্রী দলের ব্যর্থতার ইতিহাস :

০১. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম :

১৯১৯ সালে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের গোলামি থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এ দল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে এ দলের অনেক শীর্ষ নেতাসহ কর্মীরা অমানুষিক জুলুম-নির্যাতন ভোগ করেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে যখন ব্রিটিশরা এদেশকে চলে যায় তখন এ দলটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

ক. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : দেশভাগের সময় তারা ভারতেই থেকে যান। কিন্তু তারা রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সরে এসে দলটিকে দাওয়াতি সংগঠনে রূপ দান করেন। কিন্তু যেহেতু ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে এ দলের অবদান অপরিসীম, তাই ভারত সরকার তাদেরকে পার্লামেন্টে স্থায়ী কয়েকটি সংরক্ষিত আসন দান করে। তখন থেকেই তারা ভারতের অন্যতম বড় দল কংগ্রেসকে সমর্থন দিয়ে আসছেন।

খ. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তান : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা রাজনৈতিক চর্চা শুরু করেন। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সত্তর দশকে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে দলটির প্রধান মুফতি মাহমুদ রহ. উক্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর সীমান্ত প্রদেশে মদ, সুদ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু তা কার্যকর হওয়ার পূর্বেই ক্ষমতাসীন জুলফিকার আলী ভুট্টো সরকার তাকে পদচ্যুত করে! বর্তমানে তাঁর ছেলে মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে জমিয়ত পরিচালিত হচ্ছে। বিগত কয়েক নির্বাচনে তাদের অবস্থা হচ্ছে-

* ১৯৯৩ সালে বেনজীর ভুট্টোর সাথে জোট গঠন করে সংসদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির সভাপতি হন। ১৯৯৬ সালে নওয়াজ শরিফ ক্ষমতা দখলের আগ পর্যন্ত তিনি এ পদে সমাসীন থাকেন।

* ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে জমিয়ত অংশগ্রহণ করলেও কোনো আসনে জয়লাভ করেনি।

* ২০০২ সালে সব ইসলামি দলকে একসাথে করে 'মুত্তাহিদা মজলিসে আমল' নামে জোট করে এবং সে নির্বাচনে এককভাবে জমিয়ত ৪১টি, মতান্তরে ৪৫টি আসন এবং জোট হিসেবে মোট ৭২টি আসন লাভ করে। মাওলানা ফজলুর রহমান একবার সীমান্ত প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী হলেও সেখানে শরিয়া প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন।

* ২০০৮ সালের নির্বাচনে ৪টি আসনে জমিয়ত জয়লাভ করে।

* ২০১৩ সালের নির্বাচনে ১২টি মতান্তরে ১৫টি আসনে জমিয়ত জয়লাভ করে।

* ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও তাতে জমিয়ত কোনো আসনে জয়লাভ করতে পারেনি।

উল্লেখ্য, এ দলটির মধ্যে একাধিকবার ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। বর্তমানে পাকিস্তানে জমিয়ত দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি জমিয়ত 'এফ' এবং অন্যটি জমিয়ত 'এস' নামে পরিচিত।

০২. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ :

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এ দলটির কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। দলটির মহাসচিব মুফতি ওয়াক্কাস রাহিমাহুল্লাহ তিনটি প্রতীক (লাঙ্গল, খেজুরগাছ ও ধান) নিয়ে তিনবারের নির্বাচিত এমপি। এরশাদের আমলে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তারপরও ইসলামি শরিয়ত প্রতিষ্ঠায় দলটির কার্যকরী কোনো ভূমিকা দৃশ্যমান হয়নি। এ দলের সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে আপনারাই ভাবুন। পরে ২০০১ সালে এ দলটির মধ্যেও ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। সবকিছু মিলিয়ে বলা চলে যে, তারা খুব একটা কার্যকরী অবস্থানে নেই।

০৩. ইখওয়ানুল মুসলিমিন বা ব্রাদারহুড :

খিলাফতের পতন হয় ১৯২৪ সালে। তখন মুসলিমদের একতা ধরে রাখতে এবং তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দিতে ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠা হয় 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন'। তাদের শ্লোগান ছিলো- জিহাদ, তারবিয়াত ও দাওয়াত। তাদের মনোগ্রামই এর প্রমাণ বহন করে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন বায়তুল মাকদিস রক্ষার্থে ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে দলে দলে মুজাহিদ পাঠিয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনেই ইখওয়ান সরকারের চক্ষুশুলে পরিণত হয়। শুরু হয় ইখওয়ান নেতাদের ধর-পাকড়। ১৯৪৯ সালে তখনকার মিসরের রাজা ফারুকের গুপ্তবাহিনী শহিদ করে দেয় ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্না রাহিমাহুল্লাহ-কে।

এরপর ইখওয়ানের সাহায্যে ১৯৫২ সালে সেনাঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজা ফারুককে উৎখাত করে রোমে নির্বাসিত করা হয়। যেহেতু সেনা অভ্যুত্থানের প্রতি ইখওয়ানের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল, তাই সেনা সরকার নজিব তাদেরকে অনেক সমীহ করে। কিন্তু নজিবের পর যখন জামাল আব্দুন নাসের ক্ষমতায় আসল তখন সে প্রথমে ইখওয়ানকে সমর্থন করলেও পরবর্তী সময়ে ইখওয়ানকে আতঙ্ক মনে করে ইখওয়ান দমনে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং সে তৎকালীন দ্বিতীয় পরাশক্তি রাশিয়া ব্লকে যোগ দেয়। তার আমলেই সাইয়িদ কুতুব শহিদ রাহিমাহুল্লাহ-কে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়। এভাবে ইখওয়ান প্রথমবারের মতো সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তথাকথিত নুসরার দ্বারা প্রতারিত হয়।

জামালের পর ক্ষমতায় আসল আনওয়ার সাদাত। সে ক্ষমতায় এসে ইখওয়ানিদেরকে জেল থেকে মুক্ত করে দেয় এবং ইসরাইলের সাথে ১৯৭৩ সালে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে প্রথমে কিছুটা জয় লাভ করলেও পরে মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়। তখন বাধ্য হয়ে ইসরাইলের সাথে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং রাশিয়ান ব্লক থেকে মার্কিন-ইসরাইল ব্লকে যোগ দেয়। এর পুরস্কার স্বরূপ প্রথম একজন আরব হিসেবে তাকে শান্তিতে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। যেহেতু ইখওয়ান তা মেনে নেয়নি তাই শুরু হয় ইখওয়ানের ওপর নির্যাতন। এভাবে ইখওয়ান দ্বিতীয়বারের মতো প্রতারিত হয়।

আনওয়ার সাদাতের পর ১৯৮০ ক্ষমতায় আসল হোসনি মোবারক। হোসনি মোবারকের পতনের পর ইখওয়ান নতুন বন্ধুরূপে গ্রহণ করল গণতন্ত্রকে। তাই ফ্রিডম জাস্টিস পার্টি নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ক্ষমতায় গেল। কিন্তু গণতন্ত্র তাদেরকে উগড়ে ফেলল। এভাবে ইখওয়ান তৃতীয়বারের মতো প্রতারিত হলো।

গণতন্ত্রের পর ইখওয়ান অহিংস আন্দোলন করার স্বার্থে বেছে নিল রাজপথকে। গঠন করল সমমনাদের নিয়ে নতুন জোট 'আত-তাহালুফুল ওয়াতানি লিদা'মিশ শারিয়াহ' (التحالف الوطني لدعم الشرعية) অর্থাৎ শরীয়াহর সমর্থনে জাতীয় ঐক্য। যার লক্ষ্য স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, প্রগতি, গণতন্ত্র এবং সেনা স্বৈরশাসনের অবসান।

মোটকথা, ইখওয়ানের হেটে চলার পথ যখন বাধাপ্রাপ্ত হলো তখন তারা বসে বসে চলার পথ অবলম্বন করল। যখন বসার পথ বন্ধ হলো তখন তারা ধরল হামাগুড়ির পথ। কিন্তু এতকিছুর পরও আমাদেরকে শুনতে হলো ইখওয়ানের নিষিদ্ধ হওয়ার মতো প্রক্রিয়া, ইখওয়ানি নেতাদের সম্পত্তি জব্দ হওয়ার নির্মম খবর।

এই তথাকথিত অহিংস আন্দোলন তাদেরকে কী উপহার দিল? অহিংসবাদের এই ধর্মটি কি আসলে মুসলিমদের? যে ইখওয়ানের সূচনা হয়েছিল জিহাদ দ্বারা (তাদের মনোগ্রাম এবং শ্লোগান এখনও যার নিদর্শন বহন করে যাচ্ছে) আজ কোথায় সে ইখওয়ান? হাসানুল বান্না রাহিমাহুল্লাহ এর সময় যে ইখওয়ান ছিল মরুর সিংহ, আজ সে ইখওয়ান হলো রাজপথের হাতি। যাদের সদস্যসংখ্যা তো বিশাল, কিন্তু সিংহের মতো আগের সেই বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষিপ্রতা, সুদৃঢ় লক্ষ্য ও সঠিক টার্গেট নেই।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই বলেছেন :

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

'যখন তোমরা ইনা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, যা তোমাদের থেকে তিনি অপসারিত করবেন না; যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের (সেই আগের প্রকৃত) দ্বীনে ফিরে আসো।' [সুনানু আবি দাউদ : ৩/২৭৪, হাদিস নং ৩৪৬২, প্রকাশনী : আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরূত]

উল্লেখ্য যে, ইনা পদ্ধতির ব্যবসা হলো শরিয়া-নিষিদ্ধ এক ধরনের লেনদেন। হানাফি মাজহাব অনুসারে 'ইনা' বলা হয় এমন লেনদেনকে, যেখানে ঋণপ্রত্যাশী ব্যক্তির নিকট বিক্রেতা বাকিতে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অধিক দামে কোনো পণ্য বিক্রি করে, অতঃপর ঋণপ্রত্যাশী ক্রেতা পণ্যটিকে বাজারে গিয়ে তার প্রকৃত মূল্যে অন্য কারও কাছে বিক্রি করে তার মূল্য গ্রহণ করে এবং নিজের প্রয়োজন মেটায়। এরপর ঋণ পরিশোধের সময় হলে বিক্রেতা থেকে বাকিতে কেনা পণ্যের মূল্য ক্রেতা পরিশোধ করে। এটাই হলো হানাফি ফুকাহায়ে কিরামের নিকট ঈনার সংজ্ঞা ও পদ্ধতি। তবে এর আরও কিছু পদ্ধতি আছে, যা বিস্তারিতভাবে ফিকহের কিতাবসমূহে লিখিত আছে। এটার বিধান নিয়েও মতভেদ আছে। ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ এর নিকট এটা মাকরুহে তাহরিমি বা নাজায়িজ। আর ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ এর মতানুসারে এটা মাকরুহে তানজিহি বা অনুত্তম। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ-সহ প্রমুখ এখানে এ দুই মতের মাঝে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, যে পদ্ধতিতে বিক্রেতার বিক্রিত পণ্য আবার বিক্রেতার কাছেই ফিরে আসে, যেমন : বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতা পণ্যটি অধিক দামে কিনে আবার তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মধ্যস্থতায় সে বিক্রেতার কাছেই পণ্যটিকে প্রকৃত মূল্যে বিক্রি করল, তাহলে এটা মাকরুহে তাহরিমি বা নাজায়িজ হবে। আর যে পদ্ধতিতে বিক্রিত পণ্য পুনরায় বিক্রেতার কাছে ফিরে আসে না, যেমন : ক্রেতা পণ্যটিকে বাজারে গিয়ে তার প্রকৃত মূল্যে অন্য কারও কাছে বিক্রি করল, তাহলে এটা মাকরুহে তানজিহি বা অনুত্তম। আল্লামা শামি রাহিমাহুল্লাহও ইমাম ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ এর এ সমন্বয়কে পছন্দ করেছেন। [রদ্দুল মুহতার : ৫/৩২৫-৩২৬; আল-মাবসুত, সারাখসি : ১১/২১১; আল-মুহিতুল বুরহানি : ৭/১৩৯]

এখন আমরা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেই ঐতিহাসিক কথাটি স্মরণ করি, যার বাস্তবতা আজ আমরা মুসলিম উম্মাহ হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছি, যার সত্যতা আজ অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যক্ষ করছি। ইমাম হাকিম রাহিমাহুল্লাহ তারিক বিন শিহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ... فَقَالَ عُمَرُ:..إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ.

'উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার সিরিয়া সফরে বের হলেন। ... অতঃপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমরা ছিলাম অসম্মানিত এক জাতি। এরপর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। সুতরাং যখনই আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যে সম্মান খুঁজব তখনই আল্লাহ আমাদেরকে অপমানিত করবেন।' [মুসতাদরাকুল হাকিম : ১/১৩০, হাদিস নং ২০৭, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত]

এখন তাহলে বলুন, গণতন্ত্র/অহিংসবাদ কোন ধরনের ইসলাম যে, এটার মধ্যে আমরা ইসলাম খুঁজব এবং এর মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব? এটা কি ইসলাম ছেড়ে অন্য কিছুর মধ্যে সম্মান ও মুক্তি খোঁজা হচ্ছে না? আর এজন্যই তো পুরো মুসলিম উম্মাহর ওপর আজ নেমে এসেছে লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার গ্লানি। এতকিছুর পরও আমরা ইসলামের দিকে ফিরে আসছি না, ওই দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাচ্ছি না, যে দ্বীন আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী প্রত্যেক হকপন্থী জামাত।

সর্বশেষ ২০১২ সালের জুন মাসে ইখওয়ান তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাফল্যের মুখ দেখে। নির্বাচনে তারা ব্যাপক জয়লাভ করে প্রথমবারের মতো সরকার গঠন করে। ইখওয়ানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ড. মুহাম্মাদ মুরসি রাহিমাহুল্লাহ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ২০১৩ সালের ৩রা জুলাই আমেরিকা-ইসরাইলের যোগসাজসে ড. মুরসি রাহিমাহুল্লাহ এর বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। ইখওয়ানের হাজার হাজার কর্মী-সমর্থদের হত্যা করা হয়। ড. মুরসি রাহিমাহুল্লাহ-কে গ্রেফতার করে বিচারের নামে দীর্ঘ প্রহসন করে অবশেষে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কারাগারে নানারকম অমানুষিক জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে ড. মুরসি রাহিমাহুল্লাহ সর্বশেষ ২০১৮ সালে আদালত চত্বরেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন। বর্তমানে মিশরের জালিম সরকার ইখওয়ানের অন্যান্য নেতা-কর্মীদেরকেও জুডিশিয়াল কিলিংয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

০৪. জামায়াতে ইসলামি :

১৯৪১ সালে এ দলটির জন্ম। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আজ পর্যন্ত তারা কোথাও এককভাবে বা নেতৃত্ব দিয়ে জোটবদ্ধভাবে চূড়ান্ত ক্ষমতায় যেতে পারেনি। এমনকি কোনো প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও হতে পারেনি। তারা সর্বদা অন্যের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখন দিনদিন ক্রমেই সংকীর্ণ পথ দিয়ে যাত্রা করছে, যা তাদের চরম ব্যর্থতারই পরিচয় বহন করে।

এ দলগুলো ছাড়াও বিশ্বের অনেক দেশে আরও গণতান্ত্রিক ইসলামি দল আছে। যদি এগুলোর তালিকা দিতে থাকি তাহলে হয়তো তালিকা শেষ করতে না করতেই খবর আসবে, এ মুহূর্তে আরেকটি ইসলামি দলের জন্ম হয়েছে। শুধু বাংলাদেশের ইসলামি দলগুলোর সংখ্যাই এত বেশি যে, এদের সবার নাম-হিস্ট্রির হিসাব রাখা কঠিন। গণতান্ত্রিক পন্থায় তুরস্ক, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়াসহ অনেক দল নির্বাচিত হলেও অনেকে ক্ষমতায় যাওয়ার পুর্বেই ছিটকে পড়েছেন। আবার কেউ কেউ সাময়িক ক্ষমতায় গেলেও সামান্য সময়ের জন্যও কোথাও; এমনকি একটি গ্রামেও পরিপূর্ণ শারিয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এ রকম কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

ক. তুরস্ক: ১. আরবি ভাষায় আজান পুনরায় চালু করার জন্যে ১৯৬০ সালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আদনান মেন্দারেসের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। এরপর তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

২. ১৯৮০ সালে মধ্যমপন্থী-ইসলামপন্থী কোয়ালিশনের সরকারকে তুরস্কের সেক্যুলার সেনাবাহিনী আবার ক্ষমতাচ্যুত করে এবং ইসলামী দল নিষিদ্ধ করে।

৩. ১৯৯৭ সালে তুরস্কের ইসলামপন্থী প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দীন আরবাকান কট্টর ইসলামবিদ্বেষী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সেনাবাহিনীর চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

খ. তিউনিসিয়া : ১৯৮৯ সালে তিউনিসিয়ার সেনাবাহিনী ও পশ্চিমা সমর্থিত শাসক যখন দেখতে পেলো, নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও রশিদ ঘানুশির নেতৃত্বাধীন ‘আন-নাহদাহ’ স্বতন্ত্রভাবেই বিপুল ভোট পাচ্ছে তখন ২৫ হাজার ইসলামপন্থীকে বিশৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে জেলে ঢুকিয়ে দেয় আর সেই সাথে কয়েকজন নেতাকে ফাঁসিতেও ঝুলিয়ে দেয়।

গ. আলজেরিয়া : ১৯৯২ সালে আলজেরিয়াতে 'ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট' যখন বিপুল ভোটে বিজয়ী হলো তখন সেখানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হলো। ৩০ হাজার ইসলামপন্থীকে জেলে ঢুকানো হলো। এরপর শুরু হয় গৃহযুদ্ধ।

ঘ. ফিলিস্তিন : ২০০৬ সালে ফিলিস্তিনের নির্বাচনে হামাস বিজয়ী হয়। শুরু হয়ে যায় ইজরাইল ও পশ্চিমা বিশ্বের হাউকাউ। ইসরাইল গাজা আক্রমণ করে এবং গাজাকে চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ করে রাখে।

ঙ. মিশর : ২০১২ সালে মিশরে ড. মুরসি রাহিমাহুল্লাহ এর নেতৃত্বে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ব্রাদারহুড ক্ষমতায় আসে। তখন এটাকে গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামের বড় একটি বিজয় হিসাবে দেখানো হচ্ছিল। কিন্তু এক বছরের মাথায়ই সেনা অভ্যুত্থান ঘটল এবং ড. মুরসি রাহিমাহুল্লাহ-সহ হাজার হাজার নেতাকর্মীকে জেলে ঢুকানো হলো এবং অনেককে জুলুম-নির্যাতন ও স্লো পয়জনের মাধ্যমে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হলো।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপরে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের বেশিরভাগকেই প্রকৃত অর্থে ইসলামি দল বলা যায় না, বড়জোর ইসলাম ঘেঁষা জাতীয় রাজনৈতিক দল বলা যায়। আর যাদেরকে কিছুটা বলা চলে তারাও তাদের ক্ষমতাসীন অবস্থায় দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কারণ, ইসলামি রাষ্ট্রের মূল মানদণ্ড পূরণ করতে তারা পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

যদি আমরা গণতান্ত্রিক দলগুলোর প্রতি চোখ রাখি তাহলে দেখতে পাবো-

* তারা বারবার আদর্শ বদলিয়েছে।

* নিজেদের মধ্যে ভাঙ্গন তৈরি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে।

* নিজেদের প্রধান শত্রু বানিয়েছেন স্বদেশের ভিন্ন মতাবলম্বী জনতাকে।

* আসন অর্জনের মধ্যে আবহাওয়ার মতো পরিবর্তন হয়েছে।

* একই নামে একাধিক দেশে অনেক দল আছে, কিন্তু একটির সাথে আরেকটির কোনো সম্পর্ক নেই।

* উম্মাহর দুর্দিনে তাদের অবস্থান হচ্ছে, প্রথমে সভা-সেমিনার, এরপর প্রতিবাদ-সমাবেশ, সর্বশেষ নীরব দর্শক।

শারিয়াহ প্রতিষ্ঠার উপায় : এবার ভেবে দেখুন, বর্তমানে বিশ্বে কোন পদ্ধতিতে শারিয়াহ প্রতিষ্ঠিত আছে? খিলাফাহর পতন পরবর্তী কারা আবারও সক্ষম হয়েছে মুসলিম ভূখণ্ডে ইসলাম ও তাওহিদের পতাকা উড্ডয়ন করতে? এবার আসুন তাদের আদর্শ একটু পর্যালোচনা করি।

তাঁরা প্রকৃতার্থেই চিনতে পেরেছেন যে, মুসলিমদের আসল শত্রু স্বদেশী জনতা নয়; বরং বিদেশি ক্রুসেডার ও স্বদেশী দালাল। তারা শরীরের ঘাম ঝরিয়েছেন, নিজেদের রক্ত দিয়েছেন, ভুখা-অভুক্ত থেকেছেন, তবুও হিকমতের নামে মালহামার নবির (অর্থাৎ যুদ্ধের নবির) আদর্শ বদলাননি। তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে অবস্থান করলেও সবগুলো প্রায় একইসূত্রে গাঁথা। খারিজি চিন্তাধারার অধিকারী বিচ্ছিন্ন দুয়েকটি দল বাদে অধিকাংশই সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় এক ছায়াতলে ঐকবদ্ধ ও বাইআতবদ্ধ। অলরেডি তাঁরা বিশ্বের পরাশক্তিকে পরাজিত করে বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে নববি পন্থার কার্যকারিতা। পুনর্দখল করে নিয়েছে তাঁরা তাঁদের হারানো ভূমি এবং প্রতিষ্ঠা করেছে সেথায় আল্লাহর দ্বীন। দিন যত যাচ্ছে, আল্লাহর প্রশস্ত জমিনে তাঁদের ও তাঁদের অনুসারীদের দখলকৃত ভূখণ্ডের পরিধি ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সত্বরই হয়তো পুরো বিশ্ব আবারও কালেমাখচিত পতাকাবাহীদের দখলে আসছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক পন্থায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকারীদের বয়স প্রায় শত বছর হতে চলল। আর নববি পন্থায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকারীদের সূচনা এই তো সেদিনের কথা। নব্বইয়ের দশকে। আজ প্রায় শতাব্দীকাল হয়ে গেলেও গণতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বের

কোথাও এক সেকেন্ডের জন্যও পরিপূর্ণভাবে শারিয়াহ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু নববি পন্থায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকারীরা যেখানে শারিয়াহ প্রতিষ্ঠা করেন তা সবসময় 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নাবুওয়্যাহ' এর আদলেই করে থাকেন।

অনেকে হয়তো বলতে পারেন, কিছু দেশ যেমন, লিবিয়া সরকার তো সংসদে শারিয়াহ আইন পাশ করেছে; অথচ এটা তো গণতান্ত্রিক পন্থা। আমরা বলব, দেখুন, লিবীয় প্রধানমন্ত্রী আলি জাইদান কিছুদিন আগেই আমেরিকা-বৃটেনের কাছে সামরিক সহায়তা চেয়েছেন। বুঝতেই পারছেন, তারা অন্যের কৃপায় ক্ষমতায় আছে, নিজেদের সক্ষমতায় নয়। তাই তাদের এটা পূর্ণাঙ্গ শারিয়াহ নয়। এখানে কেবল ততটুকুই কার্যকর, যতটুকু আমেরিকা অনুমতি দেয়। তাই এটা কখনো নবিজির আনীত সেই শারিয়াহ হতে পারে না, যার বিরুদ্ধে ইহুদি-খ্রিষ্টানসহ পুরো কুফফারবিশ্ব একমত। তাছাড়াও আমরা ইতোপূর্বে প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সকল আইনকেও যদি ইসলামের অনুকূলে নিয়ে আসা হয়, তবুও তা ইসলামি আইন হবে না। কেননা, এটা অধিকাংশ সাংসদের চাওয়ার ভিত্তিতে আইন হয়েছে, আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন সে ভিত্তিতে নয়। তাই এটাকে কখনো শারিয়াহ প্রতিষ্ঠা বলা যায় না।

গাদ্দাফির পতন কি গণতান্ত্রিক পন্থায় হয়েছিল? বা বর্তমানে কোনো শাসক কি এমন রয়েছে, যাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই হাদিসের ওপর আমল না করে উৎখাত করা সম্ভব? সহিহ মুসলিমে জুনাদা বিন আবু উমাইয়া রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

'আমরা উবাদা বিন সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ছিলাম। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম, আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন। আপনি আমাদের এমন একটি হাদিস বর্ণনা করুন, যা আপনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন, যদ্দারা আল্লাহ আপনাকে (সওয়াব ও বিনিময় দান করে) উপকৃত করবেন। তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) আমাদেরকে ডাকলেন। অতঃপর আমরা তার হাতে বাইআত হলাম। তিনি আমাদের থেকে যে সকল বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিলেন তা হলো, আমাদের পছন্দে ও অপছন্দে, আমাদের সংকটে ও স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আমাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও আমরা (শাসকের কথা) শুনব ও মানব। আর আমরা শাসকের সাথে কর্তৃত্ব নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হবো না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফর দেখো, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ রয়েছে তাহলে ভিন্ন কথা।' [সহিহু মুসলিম : ৩/১৪৭০, হাদিস নং ১৭০৯, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত]

সালাফে সালিহিন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন ও পরবর্তী যুগের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, কোনো মুসলিম এলাকার শাসকের মধ্যে এ রকম সুস্পষ্ট কুফরি দেখা গেলে তাকে হটিয়ে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক (যিনি এসব কুফরি করবেন না; বরং ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী শাসন করবেন) নিয়োগ দেওয়া ওই এলাকার সামর্থ্যবানদের ওপর ফরজে আইন। আর সেই শাসকের সমর্থনে যদি কোনো বাহিনী থাকে তাহলে ওই বাহিনীসহই ওই শাসককে হটানো ফরজে আইন বা সবার ওপর আবশ্যক।

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন :

وَقَالَ الدَّاودِيّ: الَّذِي عَلَيْهِ الْعلمَاء فِي أُمَرَاء الْجور أَنه إِن قدر على خلعه بِغَيْر فتْنَة وَلَا ظلم وَجب، وإِلاَّ فَالْوَاجِب الصَّبْر، وَعَن بَعضهم: لَا يجوز عقد الْولَايَة لفَاسِق ابْتِدَاء، فَإِن أحدث جوراً بعد أَن كَانَ عدلا اخْتلفُوا فِي جَوَاز الْخُرُوج عَلَيْهِ، وَالصَّحِيح الْمَنْع إِلاَّ أَن يكفر فَيجب الْخُرُوج عَلَيْهِ.

'ইমাম দাউদি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আলিমরা এ ব্যাপারে একমত যে, শাসক জালিম হলে যদি ফিতনা ও জুলমের আশঙ্কা ছাড়া তাকে অপসারণ করার সামর্থ্য থাকে তাহলে তা আবশ্যক। আর তা না হলে ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যক। কতিপয় উলামায়ে

কিরামের মতে, ফাসিকের নেতৃত্ব শুরু সময় থেকে প্রতিষ্ঠিতই হয় না (বিধায় তাকে যে কোনো মূল্যে অপসারণ করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই)। আর যদি সে প্রথমে ন্যায়পরায়ণ থাকে, পরবর্তীতে সে জুলুম করে তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে মতভেদ আছে। সঠিক মত হচ্ছে, এটা নিষিদ্ধ। তবে যদি সে কুফরি করে তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অপরিহার্য হয়ে যায়।' [উমদাতুল কারি : ২৪/১৭৯, হাদিস নং ৭০৫৬ সংশ্লিষ্ট আলোচনা, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত]

সার্বিক দিক বিবেচনা করলে আমাদের এ ভূখণ্ডে ইসলামি শারিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াত, তারবিয়াত ও ইদাদ—এই তিনটি কাজের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এ তিনটি জিনিসের প্রথমটির দায়িত্বই এখনও পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে আদায় করা হয়নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাজের দায়িত্ব পালন তো পড়েই আছে। দাওয়াতের মধ্যে প্রাধান্য পাবে, কুফর-শিরকের পরিচয়, যুগের লাত-উজ্জা ও হুবালদের পরিচিতি, বিভিন্ন কুফরি-শিরকি মতবাদের মুখোশ উন্মোচন, তাওহিদ ও ইমানের পরিচয়, ইমান ভঙ্গের কারণসমূহের বিবরণ, আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার পরিচয় ও আধুনিক সভ্যতায় তার রূপরেখা, দ্বীনের মৌলিক বিধিবিধান, ইসলাম ও কুফরের সংঘাত ও এসংক্রান্ত সকল আহকাম, নবিজির সিরাত পাঠ ও তা থেকে শিক্ষা, সাহাবিদের জীবনী পাঠ ও তাঁদের কর্মপন্থা জানা। এসব বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষদের মাঝে ব্যাপক দাওয়াতি কাজ করা দরকার।

এগুলো ওয়াজ-মাহফিলে বলা জরুরি নয়; বরং প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে ব্যক্তি পরিসরে, বন্ধুমহলে, পরিবার ও আত্মীয়দের মাঝে, অফলাইনে বা অনলাইনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এসংক্রান্ত ইসলামের সঠিক ও অবিকৃত দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এসব কাজ বাদ দিয়ে প্রথমেই যদি কেউ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া জিহাদের কথা বলে এবং এটা নিয়ে ব্যাপক ফ্যান্টাসিতে ভোগে তাহলে দ্রুতই সে দ্বীনের সঠিক ট্র্যাক থেকে ছিটকে পড়তে পারে। তাই যাদের উপরিউক্ত বিষয়গুলো জানা আছে, তাদের উচিত হবে দাওয়াতি ময়দানে মেহনত বাড়ানো, আর যাদের উপরিউক্ত বিষয়গুলো এখনও অজানা, তাদের অন্য সব চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে আগে এসব বিষয়ে বেসিক নলেজ অর্জন করা আবশ্যক। বিষয়টি একটু তিক্ত লাগলেই এটাই বাস্তবতা। অতএব, সকল অলসতা কাটিয়ে আজ থেকে নিজে শিখতে শুরু করি এবং অন্যদের দাওয়াহ দিতে থাকি। কে কী করছে, কে কী বলছে, তা দেখার দরকার নেই। নিজের আকিদা-মানহাজ ঠিকভাবে বুঝাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিষ্ঠার সাথে এভাবে দাওয়াতি মেহনত চালালে এ ভূখণ্ড ইসলাম প্রতিষ্ঠার উর্বর ক্ষেত্র হতে বেশি সময় লাগবে না ইনশাআল্লাহ।